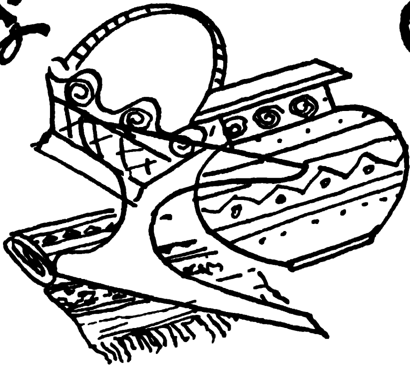
কুটির শিল্প ও



পরিকল্পনা

অনাদিনাথ সিংহ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
খালেদ চৌধুরী
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সূচীপত্র

কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। এর পরের মাসেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০৬৯ কোটি টাকা। এই বরাদ্দকে বাড়িয়ে পরে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ২৩৫৬ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৯৫২ সালে। পুরোপুরি পাঁচ বছর ধরে এর কাজ চলে নি। ফলে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির পক্ষে মোট ব্যয় হয়েছে ২০০০ কোটি টাকার কিছু কম।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪৮০০ কোটি টাকা। ভারত সরকার আশা করেন যে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আরও ২৪০০ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজে নিয়োজিত হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে সরকারী খাতে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার একটি তুলনামূলক তালিকা অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল—

	১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা		২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	
	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১। কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	**৩৫৭**	**১৫·১**	**৫৬৮**	**১১·৮**
(ক) কৃষি	**২৪১**	**১০·২**	**৩৪১**	**৭·১**
কৃষির উন্নতিবিধায়ক কার্য	১৯৭	৮·৩	১৭০	৩·৫
পশুপালন	২২	১·০	৫৬	১·১
বন	১০	০·৪	৪৭	১·০
মৎস্য চাষ	৪	০·২	১২	০·৩
সমবায়	৭	০·৩	৪৭	১·০
বিবিধ	১	...	৯	০·২
(খ) জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন	**৯০**	**৩·৮**	**২০০**	**৪·১**
(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত	**১১**	**০·৫**	**১২**	**০·৩**
(ঘ) স্থানীয় উন্নয়ন কার্য	**১৫**	**০·৬**	**১৫**	**০·৩**
২। সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ (Irrigation and Power)	**৬৬১**	**২৮·১**	**৯১৩**	**১৯·০**
সেচ	৩৮৪	১৬·৩	৩৮১	৭·৯

	১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা		২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	
	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
বিদ্যুৎ	২৬০	১১·১	৪২৭	৮·৯
বন্যা নিরোধ এবং অন্যান্য কার্য	১৭	০·৭	১০৫	২·২
৩। **শিল্প ও খনি (Industry and Mining**	**১৭৯**	**৭·৬**	**৮৯০**	**১৮·৫**
বৃহৎ ও মধ্যম শিল্প	১৪৮	৬৩	৬১৭	১২·৯
খনিজ সম্পদের সম্প্রসারণ	১	...	৭৩	১·৫
কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	৩০	১·৩	২০০	৪·১
৪। **যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (Transport & Communications**	**৫৫৭**	**২৩·৬**	**১৩৮৫**	**২৮·৯**
রেলপথ	২৬৮	১১·৪	৯০০	১৮·৮
রাজপথ	১৩০	৫·৫	২৪৬	৫·১
রাজপথে পরিবহন	১২	০·৫	১৭	০·৪
বন্দর ও পোতাশ্রয়	৩৪	১·৪	৪৫	০·৯
সমুদ্রপথে পরিবহন	২৬	১·১	৪৮	১·০
দেশের অভ্যন্তরে জলপথে পরিবহন	...	...	৩	০·১

	১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা		২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	
	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
বেসামরিক বিমান চলাচল	২৪	১·০	৪৩	০·৯
অন্যান্য পরিবহন	৩	০·১	৭	০·১
ডাক ও তার বিভাগ	৫০	২·২	৬৩	১·৩
অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা	৫	০·২	৪	০·১
বেতার	৫	০·২	৯	০·২
৫। সমাজ সেবা	**৫৩৩**	**২২·৬**	**৯৪৫**	**১৯·৭**
শিক্ষা	১৬৪	৭·০	৩০৭	৬·৪
স্বাস্থ্য	১৪০	৫·৯	২৭৪	৫·৭
গৃহ নির্মাণ	৪৯	২·১	১২০	২·৫
অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণ	৩২	১·৩	৯১	১·৯
সমাজ কল্যাণ	৫	০·২	২৯	০·৬
শ্রম ও শ্রমিক কল্যাণ	৭	০·৩	২৯	০·৬
পুনর্বসতি	১৩৬	৫·৮	৯০	১·৯
শিক্ষিত বেকার সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা	...	...	৫	০·১
৬। বিবিধ	**৬৯**	**৩·০**	**৯৯**	**২·১**
মোট	২৩৫৬	১০০·০	৪৮০০	১০০·০

উপরের তালিকাটিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে টাকার অঙ্কগুলি তুলনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশী টাকা দেওয়া হয়েছে দেশে খাদ্যশস্য বাড়ানোর জন্য। কৃষির উন্নতির জন্য ভাল সেচ ব্যবস্থার (irrigation) দরকার, তাই বাংলা দেশে দামোদর ও ময়ূরাক্ষী বাঁধ, উড়িষ্যায় হীরাকুঁদ এবং পাঞ্জাবে ভাকরা ও নাঙ্গাল প্রভৃতি বড় বড় বাঁধগুলির জন্য পরিকল্পনায় বহু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সব বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বন্যা নিরোধ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা এসে পড়ে। এই জল-বিদ্যুতের বিরাট শক্তিকে আবার দেশের ছোট বড় শিল্পগুলির কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতকরা ৩৮·৩ টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের প্রায় আড়াই ভাগের এক ভাগ টাকা দেওয়া হয়েছে শুধু সেচ ও কৃষি ব্যবস্থার জন্য। অন্য দিকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য ধরা হয়েছে শতকরা ৭·৬ টাকা মাত্র। দেশে খাদ্যশস্যের দারুণ অভাব পূরণের জন্যই পরিকল্পনা কমিশন কৃষির দিকে এতটা জোর দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে পঞ্চাশের মন্বন্তরের মর্মান্তিক কাহিনী আমাদের সকলেরই মনে আছে। যুদ্ধ মিটে যাবার পরও ভারত সরকারকে বিদেশ থেকে বছরে প্রায় তিন শ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করতে হত। এতে যে আমাদের দেশের বিপুল অর্থ বিদেশে চলে যেত শুধু তাই নয়, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের বিদেশীদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হত। হঠাৎ কোন যুদ্ধবিগ্রহের ফলে

বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে আবার আমাদের পঞ্চাশের মন্বন্তরের অবস্থা হত। এই সব দিক বিবেচনা করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য কাজগুলির তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে এত বেশী টাকা ধরা হয়েছিল।

পরিকল্পনা কমিশনের এই প্রচেষ্টা আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ৫৪০ লক্ষ টন। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে ৬৫০ লক্ষ টন, অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৮·০ ভাগ বেড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষভাগে খাদ্যশস্যের এই উৎপাদন আরও বেড়ে ৭৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে আশা করা যায়।

বেকার সমস্যা ও কুটির শিল্প

এইবার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথায় আসা যাক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রধানত আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছে। খাদ্যের জন্য আমাদের আর বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে না। কিন্তু দেশের আর একটি কঠিন সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বাংলা দেশের কথাই ধরা যাক। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে বছরে ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিত। গত বছর সেখানে ৭০ হাজার ছেলেমেয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। দেশে

আরও ব্যাপক ভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যম চলছে, তাতে অল্পকালের মধ্যেই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু এইসব ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পাশের পর সকলেই যদি সরকারী ও সওদাগরী অফিসে বা বড় বড় কলকারখানায় চাকুরি খোঁজে, তবে এদের অধিকাংশকেই নিরাশ হতে হবে। কারণ, এত লোকের স্থান সেখানে কোনদিনই হবে না। অন্যদিকে দেশে অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বেকারও রয়েছে অসংখ্য। এর উপরে আবার আছে অর্ধবেকারের দল। এমন বহু লোক আছে যারা সামান্য কাজ করে এবং সে কাজে তাদের পুরো দিনের পরিশ্রম লাগে না, তার রোজগারে তাদের সংসারও চলে না। আমাদের দেশের চাষীরাও এই অর্ধবেকারের দলে পড়ে। বৎসরের সকল মাসে তাদের চাষের কাজ থাকে না এবং সেই সময়টা তারা বেকার বসে থাকে। এই কারণে বছরে মাত্র ৫।৬ মাস খেটে তারা যে ফসল তৈরী করে, তার আয়ে তাদের সারা বছরের খরচ কুলায় না। ভূমি সংস্কার আইন করে ভূমিহীন কৃষককে যত বেশী জমিই দেওয়া যাক না কেন, তার লাঙ্গল আর বলদ নিয়ে গতানুগতিক নিয়মে সে একা চাষ করতে পারবে মাত্র বিঘে পনের জমি এবং এই জমিতে ৫।৬ মাস খেটে সে যা পাবে, তাতে তার ৫।৬ মাসই সংসার চলবে, তার বেশী চলবে না।

বেকার ও অর্ধবেকার সমস্যার এই নানাদিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

বেকার সমস্যার সমাধান করতে কুটির-শিল্পের উপর জোর দিয়েছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের জন্য দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৩০ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের ১৫·৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে এবং ১৫·৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ১৯৫৫-৫৬ সালে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির জন্য ধরা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। কুটির-শিল্প বহু বেকার লোকের কাজের ব্যবস্থা করবে এবং দেশের সম্পদ বাড়াবে। পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ নূতন লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করেন। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বিভিন্ন কাজে যে নূতন লোকের দরকার হবে, পরিকল্পনা কমিশন তার একটি তালিকা দিয়েছেন—

		নূতন লোক নিয়োগের আনুমানিক সংখ্যা (লক্ষ)
১।	বিবিধ নির্মাণ-কার্য (construction)	২১·০০
২।	সেচ ও বিদ্যুৎ	০·৫১
৩।	রেল বিভাগ	২·৫৩
৪।	অন্যান্য যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা	১·৮০
৫।	বৃহৎ শিল্প ও খনি	৭·৫০
৬।	কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪·৫০
৭।	বন, মৎস্যচাষ, জাতীয় সম্প্রসারণ ও উহার সংশ্লিষ্ট গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪·১৩

		নূতন লোক নিয়োগের আনুমানিক সংখ্যা (লক্ষ)
৮।	শিক্ষা	৩·১০
৯।	স্বাস্থ্য	১·১৬
১০।	অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্য	১·৪২
১১।	সরকারী দপ্তর	৪·৩৪
		৫১·৯৯
	ব্যবসা, বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজে	২৭·০৪
	মোট	৭৯·০৩
	অর্থাৎ মোটামুটি	৮০ লক্ষ

গোটা ভারতবর্ষে শ্রমিক বা কর্মপ্রার্থীর দলে বছরে ২০ লক্ষ নূতন লোক এসে জমে। কাজেই দেশের বেকার সমস্যা যাতে আরও গুরুতর না হয়, এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে অন্তত এক কোটি লোকের কাজের যোগাড় করতে হবে। উপরের তালিকায় কমবেশী ৮০ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। এর পর সেচ ব্যবস্থার বিস্তারের সঙ্গে নূতন আবাদী জমির পরিমাণ বাড়লে এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি হলে আরও প্রায় ১৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

১৯৫৫ সালের শেষভাগে পরিকল্পনা কমিশন ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার একটি হিসেব নিয়েছেন। এই হিসেবে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালের প্রথম ভাগে ভারতে ম্যাট্রিকুলেশন বা তার উপরের পরীক্ষায় পাশকরা বেকারের সংখ্যা হচ্ছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ এবং আগামী পাঁচ বছরে আরও

সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ লোক এই ধরনের পরীক্ষায় পাশ করে কাজের জন্য বেরুবে। কাজেই শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে এই পাঁচ বছরে ২০ লক্ষ শিক্ষিত লোককে কাজ দিতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সরকারী ভাগে দশ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হবে। পুরানো লোক কাজ থেকে অবসর নেবার ফলে আরও প্রায় আড়াই লক্ষ শিক্ষিত বেকারের চাকুরি মিলবে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও ২ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের বাকি লোকগুলিকে জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য উপায় গ্রহণ করতেই হবে—সে উপায় হচ্ছে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নানা ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

জাতীয় আয় ও কুটির-শিল্প

আমাদের জাতীয় আয়ের দিক থেকেও কুটির শিল্পের গুরুত্ব খুব বেশী। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো। জাতীয় আয় বাড়লেই আমরা বুঝতে পারি যে, কৃষি, শিল্প, যানবাহন ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে, ফলে দেশের উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের জাতীয় আয় শতকরা ১৮ টাকা বেড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় শতকরা আরও ২৫ টাকা বাড়বে। অন্যদিকে প্রথম পরিকল্পনায় মাথাপিছু খরচ বেড়েছে শতকরা ৯ টাকা

এবং মাথাপিছু আয় বেড়েছে শতকরা ১১ টাকা।

কিন্তু, জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধির কথা বিচার করতে গেলে এই হিসেব যথেষ্ট নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয় যে পরিমাণ বেড়েছে, তার বেশীর ভাগই গিয়েছে বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঘরে। দেশের সাধারণ কৃষক বা শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বিশেষ বাড়ে নি। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষি অথবা কৃষির সংশ্লিষ্ট কাজে জীবন যাপন করে। মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৩ জন ভারতের পল্লী অঞ্চলে বাস করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন তাই পল্লী-ভারতের পুনর্গঠনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। এ কাজে তাঁদের প্রধান সহায় হল কৃষি, কুটির-শিল্প ও সমবায়। পল্লীর কৃষকেরা চাষের অবসরকালে যদি কুটির-শিল্পের কাজ করে, তবে বছরে পুরো বারোমাস তারা খাটতে পারবে, তাদের আয়ও অনেক বেড়ে যাবে। সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের আয় এই উপায়ে বৃদ্ধি পেলে ভারতের জাতীয় আয় আরও বহু পরিমাণে বেড়ে যাবে; শুধু তাই নয়, দেশের কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির লোকের মধ্যে উপার্জনের যে তারতম্য আছে, তাও আস্তে আস্তে দূর হবে। জাতীয় সরকার যে কল্যাণধর্মী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প নিয়েছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই সব কাজের মধ্য দিয়েই তার পাকা বনিয়াদ গড়ে উঠবে।

ক্ষুদ্র বনাম বৃহৎ শিল্প

কলকাতা থেকে উত্তরে কাঁচরাপাড়া আর দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত হুগলী নদীর দুই তীরে বড় বড় কলকারখানাগুলি সার বেঁধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বিরাট কলেবর, অসংখ্য লোকলস্কর আর অফুরন্ত ঐশ্বর্য দেখে চোখ ঝলসে যায়; মনে হয় যেন গঙ্গাতীরের এই শিল্পাঞ্চল গোটা বাংলা দেশের হৃৎপিণ্ড। সারা বাংলা দেশের (এখন পশ্চিমবঙ্গের) লোকের খেয়েপরে বেঁচে থাকবার জন্য যে অর্থ ও সম্পদ দরকার, তা যেন শুধু এখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে।

ধারণাটা একদিক দিয়ে সত্য। বৃহৎ শিল্প বাংলা দেশের চারটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যথা,—(১) হুগলী তীরের শিল্পাঞ্চল (পাট ও অন্যান্য শিল্প), (২) আসানসোল মহকুমার শিল্পাঞ্চল (লৌহ ও কয়লা শিল্প ও রেলের কারখানা) (৩) খড়্গপুর (রেলের কারখানা) এবং (৪) ডুয়ার্স ও দার্জিলিঙের চা-শিল্পাঞ্চল। এদের মধ্যে হুগলী তীরের শিল্পাঞ্চলই সবচেয়ে বড়। এখানে প্রায় একশ চটকল আছে, তাতে বছরে সাড়ে চারশ কোটি (১৯৫০ সালের দরে) টাকার ধনসম্পদ উৎপন্ন হয়। ১৯৪৮ সালে ভারতের বৈদেশিক বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া গিয়েছে, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এসেছে শুধু এই পাটশিল্প থেকে।

কিন্তু, বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের খাওয়া-পরা ও কর্মসংস্থানের কথা যখন চিন্তা করা যায়, তখন বৃহৎ শিল্পের এই সম্পদ ও শক্তির উপরে আমাদের ভরসা কমে আসে। পশ্চিমবঙ্গের ৯৫টি পাটের কলে ৩ লক্ষ লোক কাজ করে। অর্থাৎ সেখান থেকে ৩ লক্ষ পরিবারের অন্নসংস্থান হয়। এখানকার ২৯টি কাপড়ের কলে ২১ হাজার লোক কাজ করে, অর্থাৎ একুশ হাজার পরিবার এই কাজে প্রতি-পালিত হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সাধারণ কুটিরে বর্তমানে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তাঁত (Handloom) চলছে। কমপক্ষে আড়াই লক্ষ লোক এই তাঁতগুলিতে কাজ করছে, এবং এর আয়ের দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ পরিবারের খাওয়া-পরা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে পিতল-কাঁসার বাসন তৈরির কাজে ১২ হাজার পরিবারের ভরণপোষণ হচ্ছে এবং গুড় তৈরির কাজে ৫ হাজার লোক খাটছে।

সমস্ত ভারতবর্ষে ২ কোটি লোক কুটির-শিল্পে কাজ করে। হস্তচালিত তাঁতের (Handloom) কাজে ভারতে ৫০ লক্ষ লোক খাটছে, অর্থাৎ ভারতের অন্যান্য বৃহৎ শিল্পে এবং খনিতে মোট যত লোক কাজ করে, শুধু হস্তচালিত তাঁতের কাজে তত লোক নিযুক্ত আছে।

এইসব ছোট ছোট শিল্প কাজগুলির বাহ্যিক কোন জাঁক-জমক নেই, তাই সাধারণত এগুলি চোখে পড়ে না। এই ধরনের বহু কুটির শিল্প বহু পরিবারের অন্নসংস্থান করছে। অনেক পুরানো কুটির-শিল্প আজ লোপ পেতে বসেছে, তবু

উপরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে যে, বৃহৎ শিল্পের যতই অর্থ আর আড়ম্বর থাক না কেন, দেশের অতি অল্প-সংখ্যক লোকই তার দ্বারা প্রতিপালিত হয়, কারণ দেশের সকল অংশে তার বিস্তার নেই। অন্যদিকে কুটির-শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্প সারা দেশময় ছড়িয়ে গিয়ে লক্ষ লক্ষ পরিবারের অন্নবস্ত্র যোগাতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে তাই কুটির-শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্পের একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে।

বিভিন্ন বৃত্তি থেকে ভারতের যে জাতীয় আয় হয় তার তুলনামূলক বিচার করলে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। নিচের তালিকায় বিভিন্ন বৃত্তি হতে জাতীয় আয়ের শতকরা হার দেওয়া হচ্ছে—

বিভিন্ন বৃত্তি	১৯৫২-৫৩ : মোট জাতীয় আয়ের শতকরা হার	১৯৫৩-৫৪ : মোট জাতীয় আয়ের শতকরা হার
কৃষি (বন, পশুপালন ও মৎস্যচাষ সহ)	৪৮·৬	৫০·৯
খনি, শিল্প, খুচরা ব্যবসা	১৭·৮	১৭·০
বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, বীমা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (রেলপথ, ডাক ও তারসহ)	১৮·০	১৭·০
অন্যান্য	১৫·৭	১৫·২

খনি, শিল্প ও খুচরা ব্যবসার যে শতকরা হার দেখানো হয়েছে তার মধ্যে বৃহৎ শিল্পের শতকরা হার হবে মাত্র ৪·৫।

মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেক এসেছে কৃষি থেকে। কৃষি হচ্ছে দেশের শতকরা ৭০ জন লোকের উপজীবিকা। দেশের অগ্রগতির দিক দিয়ে এটা মোটেই ভাল কথা নয়। যত কম সংখ্যক লোকের দ্বারা দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করা যাবে, অর্থনৈতিক বিচারে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল, কারণ তাহলে বাকি লোকদের অন্যান্য নানাবিধ উৎপাদনের কাজে লাগানো যাবে। আমেরিকায় কর্মরত লোকদের শতকরা মাত্র ২২ জন কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে, আর তার ফলে তাদের দেশের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটিয়ে শস্য উদ্‌বৃত্ত হয়। এদিকে ভারতে কর্মরত লোকদের শতকরা ৬৭ জন চাষের কাজ করে, তবু আমাদের খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়ে। এই অবস্থার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা কমিশন সেচ, জমির সার, কৃষির যন্ত্রপাতি এবং সমবায় পদ্ধতিতে চাষ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় কৃষি-সমবায় গঠন করে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করলে খুব কমসংখ্যক শ্রমিক দিয়ে অনেক বেশী শস্য উৎপন্ন করা যাবে। কিন্তু, তখন সমস্যা হবে যে, যে শতকরা ৬৭ জন লোক আজ চাষের কাজে নিযুক্ত, তাদের মধ্যে যারা বাড়তি হবে তারা যাবে কোথায়, কি নূতন কাজ ধরবে? এই সমস্যার একমাত্র সমাধান এদের জন্য কুটির-শিল্পের ব্যবস্থা করা।

চাষের কাজ মামুলী প্রথায় চলতে থাকলেও চাষীদের

মধ্যে কুটির-শিল্পের বিস্তার দরকার, একথা আগেই বলা হয়েছে। বছরে ৫ মাস তাদের পুরো কাজ থাকে, তারপরেই বেকার। কুটির-শিল্পের কাজ তারা চাষের অবসরে অনায়াসেই করতে পারে। এতে তাদের আয় বাড়বে, সংসারে সচ্ছলতা আসবে।

দেশের বেকার এবং অর্ধবেকার দলের এই বিরাট জন-শক্তিকে কুটির-শিল্পের কাজে ব্যবহার করতে পারলে আমাদের জাতীয় আয় বহু পরিমাণে বেড়ে যাবে, অপরদিকে কৃষির আয়ও কমবে না, বরং বেড়েই যাবে।

দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে কুটির-শিল্পের স্থান দেখাতে গিয়ে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের গুরুত্বকেও লঘু করা চলবে না। এ যুগে মানুষের জীবনযাত্রার মান এত বেড়ে চলেছে যে, তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী উদয়াস্ত না খেটে অল্প সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে সংগ্রহ করবার জন্য তাকে আধুনিক যন্ত্রের অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পের সাহায্য নিতেই হবে। পরিকল্পনা কমিশন তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ ও মধ্যম আয়তনের শিল্পগুলির উন্নতির জন্য প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অনেক বেশী টাকা (চার গুণ) বরাদ্দ করেছেন। ভারত সরকার দেশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক (Basic) শিল্প-গুলির বিস্তার ও উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়েছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারের কর্তৃত্বে এবং পরিচালনায় এই সব মৌলিক শিল্পগুলির সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই সকল বৃহৎ শিল্পে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বৃহৎ শিল্প যত বৃহৎই হোক না কেন, জন-স্বার্থের দিক দিয়ে কুটির-শিল্পের মূল্য কোন দেশেই কমে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকায় ৩৯ লক্ষ ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, এর এক-একটি প্রতিষ্ঠানে এক থেকে চারজন মাত্র শ্রমিক কাজ করে। যুক্তরাজ্যে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৯ ভাগ উৎপন্ন হয় এমন সব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে, যেখানে মাত্র ৫ থেকে ৩০ জন শ্রমিক কাজ করে এবং যুক্তরাজ্যের মোট কর্মরত লোকদের শতকরা ২৯ জন এই সব প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত আছে। ১৯৩০ সালের হিসাবে জাপানে যত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল তার শতকরা ৫৪ ৩টিতে ২ থেকে ৪টি মাত্র শ্রমিক কাজ করত। ১৯৩১ সালের পর থেকে জাপানে বড় কারখানা অনেক বেড়েছে, তবু বর্তমানেও জাপানের শিল্পক্ষেত্রে কুটির-শিল্পেরই প্রাধান্য রয়েছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জাপান প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশগুলির কুটির-শিল্প অবশ্য আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চালিত। আমাদের দেশের কুটির-শিল্পকেও এভাবে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে। পরবর্তী প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

কুটির-শিল্পের সংগঠন ও সমস্যা

বাংলাদেশের তাঁত ও রেশমশিল্পের একদিন জগৎজোড়া খ্যাতি ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক সময় এ দেশের

তাঁতে তৈরী সাত-শ রকম কাপড়ের নমুনা বিলাতে পাঠিয়েছিল, যাতে ঐসব নমুনা দেখে তাদের দেশে কাপড় তৈরি করা যায়। ১৭৮৭ সালে ৩ লক্ষ পাউণ্ড দামের মসলিন ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে এই মসলিন-শিল্প এত উন্নত ছিল যে, শিল্পীদের এক বিরাট উপনিবেশ এখানে গড়ে উঠেছিল, এবং ব্রিটিশ শাসনে আসার পূর্বে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২ লক্ষ। পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে শহরের শিল্প ও ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, 'লণ্ডনের মতই মুর্শিদাবাদ শহর বিরাট এবং সমৃদ্ধ, বরং লণ্ডনের তুলনায় অনেক বেশী সম্পদ-শালী লোক এখানে বাস করে।' প্রায় তিন-শ বছর ধরে রেশম শিল্প এই জেলার প্রধান শিল্প ছিল, হাজার হাজার লোক এই কাজে খাটত। দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে ক্যালিকো নামে ঢাকাই মসলিনের মতই আর-এক রকম সূক্ষ্ম বস্ত্র পাওয়া যেত, পর্তুগীজ বণিকেরা এগুলি কিনে ইউরোপে চালান দিত।

শুধু তাঁতের জিনিস নয়, ভারতের কুটির-শিল্পের আরও নানারকম পণ্য ইউরোপের বাজারে আদরের সঙ্গে বিক্রি হত। দু-হাজার বছর ধরে ভারতীয় শিল্পীর তৈরী মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, হাতির দাঁতের জিনিস এবং অন্যান্য চারুশিল্পের বিনিময়ে ইউরোপ থেকে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ভারতে এসেছে। ঐতিহাসিক প্লিনি এই কারণে দুঃখ করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষ ইউরোপ থেকে বছরে

কমপক্ষে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ সেস্টারসেস (৪,৩৮০০০ পাউণ্ড) শোষণ করে নেয় এমন সব পণ্যদ্রব্য দিয়ে, যা তৈরি খরচের একশ গুণ চড়া দামে বিক্রি হয়ে থাকে।'

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ভারতের এই বিপুল শিল্প ধ্বংস হতে চলল। ১৮১৭ সালে ইংলণ্ডের ভারতীয় মসলিনের রপ্তানি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নূতন নূতন কল-কারখানার প্রতিযোগিতা আর বিদেশী শাসকদের বিরোধিতা, এই দুয়ে মিলে ভারতের কুটির-শিল্প ধ্বংস করল। যে ভারতের বাজারে কাপড় কিনবার জন্য এককালে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলত, সেই ভারতেই ইংরেজ শাসকগণ ম্যাঞ্চেস্টারের কলের কাপড় আমদানি করে দেশীয় বয়নশিল্পের সর্বনাশ করল।

ভারতে ইংরেজ সরকারের নীতি হল, এখান থেকে শুধু কাঁচা মাল ইংলণ্ডে সরবরাহ করা, আর তারই সমাপ্ত দ্রব্য (finished goods) আবার ভারতে এনে চড়া দামে বিক্রি করা।

কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতের কতকগুলি কুটির-শিল্প আজও টিকে আছে। আমাদের দেশের কামার (সোনা, রুপা ও লোহার), কাঁসারী, কুমোর, ছুতোর ও তাঁতী প্রভৃতির শিল্প হচ্ছে সাধারণত তাদের বংশগত বৃত্তি। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক জাতির লোক বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, শীতলপাটি ও মাদুর-শিল্প প্রভৃতি বংশপরম্পরায় করে আসছে। কাজেই বর্তমান অবস্থায় এই সব বৃত্তি থেকে

তাদের আয়ের পরিমাণ যাই হোক না কেন, তারা বংশানুক্রমে আজও এই শিল্পগুলিকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু এই সকল শিল্পকে লাভজনক বৃত্তি বা ব্যবসায়ে দাঁড় করাতে যে শিল্প ও অর্থের প্রয়োজন তাদের তা নেই। ফলে গ্রামে ঘরে বসে মামুলী ধরনে তারা যে কাজ করে, তার আয়ে তাদের দিনপাত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাঠের কাজ করে আমাদের দেশের ছুতোরদের দারিদ্র্য ঘোচে না, অথচ কলকাতার চীনা মিস্ত্রিরা ভাল রোজগার করে এবং দেশীয় ছুতোরদেরই খাটিয়ে নিয়ে ফার্নিচারের দোকানগুলি প্রচুর লাভ করে। পল্লীর চর্মকারেরা ভাত পায় না, কিন্তু তাদেরই কাছ থেকে কাঁচা চামড়া কিনে নিয়ে ব্যবসা করে অবাঙালী মুসলমান ব্যাপারীর দল বড়লোক হয় এবং এদেরই পরিশ্রমে বড় বড় জুতার কারখানাগুলি ও চীনাদের জুতার দোকানগুলি বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে। আগে গৃহস্থের ঘরে ঘরে মাটির হাঁড়ি-কলসী, পিতল-কাসার বাসনপত্র ও পাথরের থালা, বাটি বহু সংখ্যায় ব্যবহৃত হত, এখন সেখানে অ্যালুমিনিয়াম ও এনামেল-করা লোহার নানা ধরনের হাঁড়ি, কড়াই, বাসনপত্র এসে স্থান পেয়েছে। ফলে, যে পয়সা আগে এই সব কুটির-শিল্পের শ্রমিকেরা পেত, সে পয়সা এখন কল-কারখানার মালিকেরা পাচ্ছে। তাই এই যন্ত্রযুগে পুঁজিপতি ব্যবসাদারদের প্রতিযোগিতার সম্মুখে কুটির-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বর্তমান পরিবেশ অনুযায়ী তার পুনর্গঠনের প্রয়োজন। এই পুনর্গঠনের গোড়াতেই প্রধানত

দুটি জিনিসের দরকার,—(১) কুটির-শিল্পীদের সংঘবদ্ধতা, এবং (২) রাষ্ট্রের সহায়তা ও শিল্প-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা। যন্ত্রের সাহায্যে বৃহৎ শিল্প যেমন কুটির-শিল্পের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে, কুটির-শিল্পকেও তেমনি তার উপযোগী ছোট ছোট যন্ত্র গ্রহণ করে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত শক্তিশালী হতে হবে। •

পরিকল্পনা কমিশন কুটির-শিল্পের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করে তাঁদের কর্মসূচী প্রস্তুত করেছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের মামুলী ক্ষেত্রকে অনেক বিস্তৃত করা হয়েছে, অর্থাৎ কুটির-শিল্প ও বৃহৎ শিল্প এই দুয়ের মাঝামাঝি শিল্পের আর-একটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে। এই স্তরের শিল্পের নাম ক্ষুদ্র শিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। গতানুগতিক কুটির-শিল্পে গ্রামের কারিগর তার নিপুণ হাত ও সাধারণ হাতিয়ারের সাহায্যে কাজ করে। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করা হবে, ফলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে যাবে, উৎপাদন-খরচও কমবে। এবং ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী বা সহযোগী শিল্প হিসাবে টিঁকে থাকতে পারবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ক্ষুদ্র শিল্পকেও কুটির-শিল্পের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। সুতরাং পুনর্গঠিত কুটির-শিল্পকে আমরা দুই আকারে দেখতে পাচ্ছি। যথা—

(১) কুটির-শিল্প বা গ্রাম-শিল্প

(২) ক্ষুদ্র শিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

অনেক কৃষিজাত দ্রব্য গ্রাম-শিল্পের প্রধান উপকরণ। সুতরাং গ্রামের কৃষির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে গ্রাম-শিল্প গড়ে উঠবে। কৃষিকে এখানে অবশ্য ব্যাপক অর্থে ধরা হয়েছে, যেমন, (১) বাঁশ ও বেতের কাজ, (২) নানাবিধ কাঠের কাজ, (৩) পাট, শন ও নারকেলের ছিবড়ের দড়ি, পাপোশ ও কার্পেট শিল্প, (৪) আসন, শতরঞ্চ ও বস্ত্র শিল্প, (৫) পাটি ও মাতুর শিল্প, (৬) হাতে তৈরী কাগজ শিল্প, (৭) তালপাতার পাখা, ব্যাগ ও টুপি তৈরির কাজ, (৮) ঢেঁকিছাটা চাল, তেলের ঘানি (৯) চিড়া, মুড়ি, রুটি ও বিস্কুট তৈরি, (১০) নানারকম ফলের মোরব্বা, সিরাপ ও জেলি তৈরি, (১১) গুড়, চিনি ও মিছরি তৈরি (১২) মধু ও মোম উৎপাদন, (১৩) মৎস্যচাষ (১৪) হাঁস ও মুর্গী পালন (১৫) রেশম উৎপাদন (১৬) বিড়ি ও তামাক প্রভৃতি শিল্পগুলির প্রত্যেকটি কৃষির সঙ্গে জড়িত বলে গণ্য করা হয়েছে। গ্রামের কৃষক এবং অল্পশিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে এই ধরনের শিল্প সহজেই চালু করা যেতে পারে। এই সকল গ্রাম-শিল্পের সঙ্গে গ্রামের কৃষি ও কৃষিজীবীদের বহুকালের যোগাযোগ রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত এই শিল্পগুলি ছাড়া আরও নানাধরনের কুটির-শিল্প আমাদের গ্রামাঞ্চলে চলে আসছে, যথা—(১) মাটি, পাথর ও পিতল কাঁসার বাসনপত্র, দেবদেবীর মূর্তি, পুতুল ও খেলনা, (২) সোনা-রুপার কাজ, (৩) চর্মশিল্প, (৪) ব্রাশ, (৫) দর্জির কাজ, (৬) মোজা ও গেঞ্জি তৈরি, (৭) ছুরি, কাঁচি, পেরেক, কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতি লৌহ শিল্প, (৮) টিন ও

লোহার পাতের জিনিসপত্র, (৯) চিরুনি ও বোতাম শিল্প (১০) মোমবাতি, কালি, সাবান, গন্ধতৈল ও গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উৎপাদন (১১) শাঁখার কাজ, (১২) কাগজের বাক্স তৈরির কাজ, ইত্যাদি।

কুটির-শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে প্রচলিত গ্রাম-শিল্পগুলিকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। গ্রাম-শিল্পের সংগঠন ও পরিচালন-ব্যবস্থা এমন করতে হবে যাতে এর আয়ে গ্রামের কারিগরদের মজুরি পোষায় এবং তাদের সংসারে অন্নবস্ত্রের অভাব পূরণ হয়; দ্বিতীয়, বেকার এবং অর্ধবেকারদলের যত বেশী সম্ভব লোককে এই কাজে টেনে আনতে হবে। এই প্রধান দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

গ্রাম-শিল্পের সংগঠনের মধ্য দিয়ে গ্রামের শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হতে শিখবে, এক-এক ধরনের শিল্প নিয়ে এক-একটি সমবায় সমিতি গড়ে উঠবে এবং গ্রাম-শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ শিক্ষা বা ট্রেনিংএর সুযোগ পাবে। সরকারী ব্যবস্থায় কুটির-শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য বহু শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হবে। এই ভাবে দেশের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সমবায় ব্যবস্থা এগিয়ে গেলে, অল্পকালের মধ্যেই এক-একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে অথবা সুবিধাবিশেষে পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা তার বেশী গ্রামকে কেন্দ্র করে বহু ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গড়ে উঠবে। দ্বিতীয়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নতির জন্য ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার হবে, এখানে অনেক শ্রমিক এক সঙ্গে কাজ করবে এবং উৎপাদনের খরচ ও জিনিসের উৎকর্ষের দিক দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের মতই নির্ভরযোগ্য হবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সীমারেখা কোথায়? বৃহৎ শিল্পের ন্যায় ক্ষুদ্র শিল্পেও যন্ত্রপাতি ও যৌথ মূলধন ব্যবহৃত হচ্ছে। অতএব ক্ষুদ্র শিল্প কতটুকু ক্ষুদ্র থাকলে সে বৃহৎ শিল্পের দলে পড়বে না এবং সরকারের কুটির-শিল্প পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে? নিখিল ভারত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-Scale Industries Board) সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সেই সমস্ত শিল্প বা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে গণ্য হবে, যার চলতি মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার কম এবং যেখানে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কাজ হয় ও মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ জনের কম। যে সকল প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার হয় না, তাদের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার কম থাকলে এবং শ্রমিকের সংখ্যা একশ জনের কম হলে, সেগুলিও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলে ধরা হবে। ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় রাজস্ব কমিশনের (Indian Fiscal Commission) মতে গ্রাম-শিল্প বা তথাকথিত কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে প্রভেদ এই যে, গ্রাম বা কুটির-শিল্প প্রধানত একটি পরিবারের নিজেদের লোকজন

দিয়ে চালিত হয়, অপরপক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সাধারণত বেতনভোগী শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে এই ধরনের কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। তাঁদের মতে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন ও শিল্পোন্নতির উপরে এই দুয়ের পার্থক্য নির্ভর করে, অর্থাৎ গ্রামের কুটির-শিল্পগুলিকে সমবায় পদ্ধতিতে এবং উন্নততর প্রণালীতে পরিচালিত করতে পারলে কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে প্রভেদ থাকবে না।

দেশময় নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। অতএব নূতন ক্ষুদ্র শিল্প অথবা বৃহৎ শিল্পগুলিকে কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না রেখে যতদূর সম্ভব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাহলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের লোকেরা এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার সমান সুযোগ পাবে। ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি Controlling Board গঠন করেছেন। এই 'বোর্ড' নূতন বৃহৎ শিল্পের স্থান নির্বাচনে নির্দেশ দেবেন। নূতন কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান নির্বাচন রাজ্য সরকার করবেন।

কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যাগুলির আলোচনা করতে শিল্পগুলিকে নিচের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :—

১। সাধারণ গ্রামশিল্প—যা গ্রামের কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমজীবীরা তাদের মূল কাজের অবসরে করে। এই সব

শিল্পের জিনিস (যথা, চিড়া, মুড়ি, ডালা, কুলা, ঝুড়ি, ইত্যাদি) সাধারণত গ্রামের গৃহস্থ-ঘরের জন্যই তৈরি হয়। কখন কখন দূরবর্তী হাটে বাজারেও এই সব শিল্পদ্রব্য চালান যায়।

২। বৃত্তিমূলক কুটির-শিল্প—যা একদল সুদক্ষ কারিগর গ্রামের বা শহরের প্রয়োজন মেটাতে সাধারণত বংশগত বৃত্তি হিসাবে করে আসছে, যেমন, সূত্রধর, স্বর্ণকার, লৌহকার, কুম্ভকার, কর্মকার ইত্যাদি।

৩। আঞ্চলিক শিল্প—যেগুলি কোন বিশেষ অঞ্চলে বহুসংখ্যায় গড়ে উঠেছে এবং ব্যবসা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন বেনারসী শাড়ি, খাগড়াই বাসন।

৪। বিশেষ নৈপুণ্য-পূর্ণ কারু-শিল্প—সূক্ষ্ম কাজ এবং সৌন্দর্যের জন্য দেশের ভিতরে এবং বিদেশের বাজারেও যার চাহিদা আছে।

৫। ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে উৎপাদনের অনেকটা সুবিধা আছে এমন সব শিল্পদ্রব্য—যেমন, তালা, মোমবাতি, বোতাম, চপ্পল ইত্যাদি। বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতায় এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা খুব কম।

৬। (ক) বৃহৎ শিল্পের সহযোগী (Subsidiary) হিসাবে কাজ করতে পারে এমন ক্ষুদ্র শিল্প—যেখানে বৃহৎ শিল্পের সমাপ্ত দ্রব্যের বিশেষ কোন অংশ মাত্র তৈরি হয় এবং বৃহৎ শিল্প এই অংশগুলি সংগ্রহ করে তার সমাপ্ত দ্রব্য বাজারে উপস্থিত করে।

(খ) কোন সমাপ্ত দ্রব্যের এক-একটি অংশ তৈরি করে

এমন সব ক্ষুদ্র শিল্প—বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি বিভিন্ন অংশগুলি পরে একটি কেন্দ্রীয় কারখানায় একত্র করে সমাপ্ত দ্রব্যটি উৎপন্ন হয়।

(৭) সমাপ্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে এমন ক্ষুদ্র শিল্প—যেমন হস্তচালিত তাঁত-শিল্প।

কুটির-শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলি হচ্ছে এই—

(১) কাঁচা মাল সংগ্রহ
(২) অর্থ-সমস্যা
(৩) সমাপ্ত দ্রব্যের বিক্রয়-সমস্যা
(৪) উৎপাদনে নৈপুণ্য ও বিশেষ শিক্ষা
(৫) কুটির-শিল্পে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার
(৬) বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা
(৭) সমবায় ও সঙ্ঘবদ্ধ কুটির-শিল্প

উৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহে বৃহৎ শিল্পের যথেষ্ট সুবিধা আছে। বৃহৎ শিল্পের মোটা মূলধন থাকে। তার উৎপাদনের পরিমাণও খুব বেশী, সুতরাং কাঁচামালের প্রয়োজনও প্রচুর। একসঙ্গে সুবিধা দরে বহু পরিমাণে কাঁচা মাল বৃহৎ শিল্প সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু কুটির-শিল্পের এই সুবিধা নাই। তার সামান্য পরিমাণ কাঁচা মাল সংগ্রহে মালের দর বেশী পড়ে। সংগ্রহের জন্য যাতায়াত-ব্যয় ও

মালের ভাড়া ইত্যাদির খরচও গড়পড়তায় বেড়ে যায়। কিন্তু যদি এক শ্রেণীর দশটি বা কুড়িটি কুটির-শিল্প-প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে, তবে মালের দর ও সংগ্রহের খরচের দিক থেকে সুবিধা হয়। এক-একটি অঞ্চলের এক-জাতীয় কুটির-শিল্পগুলির সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হলেই কাঁচামাল সংগ্রহের এই সুযোগ পাওয়া যাবে।

পরিকল্পনা কমিশন কুটির-শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কথাও বলেছেন। যে সমস্ত কাঁচামাল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন (controlled goods), সেগুলি সরবরাহের ব্যাপারে বৃহৎ শিল্পের তুলনায় কুটির-শিল্পকে বেশী সুযোগ দেবার কথা সুপারিশ করা হয়েছে। যে সকল কাঁচামাল সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়, সেগুলিও কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে ন্যায্য মূল্যে পেতে পারে, সরকার এরূপ ব্যবস্থা করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হস্ত-চালিত তাঁতের জন্য বৃহৎ শিল্পের (Spinning Mills) নিকট থেকে কুটির-শিল্পকে সুতা খরিদ করতে হয়। সুতার মিলগুলি তাঁতীর কাছে চড়া মুনাফা চেয়ে বসলে সে সুতার তৈরি কাপড় কোনমতেই মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাজারে দাঁড়াতে পারবে না। দুই উপায়ে হস্তচালিত তাঁতের কারিগর এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে—(এক), যদি সরকার এক্ষেত্রে সুতার একটা ন্যায্য মূল্য ঠিক করে দেন, (দুই), যদি হস্তচালিত তাঁতের প্রয়োজনীয় সুতা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন স্থানে তাঁতীদের সমবায় সুতাকল স্থাপিত হয়।

যেখানে মূলধনের অভাবে কুটির-শিল্পের কারিগরগণ সময়-মত কাঁচামাল সংগ্রহ করতে না পারে, সেখানে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের মারফত কাঁচামাল সরবরাহ করা যেতে পারে।

কুটির-শিল্পের মূলধন ও সমাপ্ত দ্রব্যের বিক্রয়-সমস্যার সহজ সমাধান হচ্ছে সমবায়-শিল্পের সংগঠন। এক-জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্র করে সমবায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে মূলধন আপনা হতেই বাড়ে, তারপর সরকারের সমবায় বিভাগ থেকে এরূপ সমবায় প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ-মেয়াদী কিস্তিতে প্রচুর ঋণ পাওয়া যেতে পারে। একক কুটির-শিল্পকেও অবশ্য সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু সমবায় শিল্পের পক্ষেই সরকারী ঋণ ও সাহায্য সহজলভ্য।

কাঁচামাল সংগ্রহের মত সমাপ্ত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যাপারেও কুটির-শিল্পের কারিগরকে তার মাল নিয়ে বাজারে উপস্থিত হতে হয়, এতে তার সময় এবং অর্থ দুইই নষ্ট হয়। সমবায় পদ্ধতিতে অনেকগুলি কারিগরের সমাপ্ত দ্রব্য একসঙ্গে বাজারে নেওয়া ও বিক্রির ব্যবস্থা থাকলে কারিগরদের ব্যক্তিগত সময় ও যাতায়াতের ব্যয় অনেকখানি বাঁচে। কারিগরেরা নিজেদের চেষ্টায় এই রকম সমবায় বিক্রয়-কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে খুব ভাল হয়। সরকারও এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনায় অনেকগুলি সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র খোলার কথা বলা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন কুটির-শিল্পের জিনিসগুলি একত্র সংগ্রহ করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হবে।

শুধু সমবায় বিক্রয়-কেন্দ্র খোলাই যথেষ্ট নয়, বাজারে কুটির-শিল্পের চাহিদা যাতে বাড়ে, তার যত্ন নিতে হবে। আগে কুটির-শিল্পে যে সব জিনিস তৈরি হত, তার অনেক জিনিস আজকাল বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে উৎপন্ন হচ্ছে। কলের জিনিস সাধারণত দেখতে চকচকে এবং গড়নে পরিপাটি। সুতরাং বাজারে চাহিদা বাড়াতে গেলে কুটির-শিল্পে তৈরি জিনিস-গুলিরও যাতে উৎকর্ষ বাড়ে সে চেষ্টা করতে হবে। প্রথম প্রথম হাতে-তৈরি জিনিসের দাম কলে-তৈরি জিনিসের চেয়ে কিছু বেশী পড়তে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে দর এবং স্থায়িত্বের দিক থেকে কুটির শিল্প-দ্রব্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করতে হবে।

আমাদের বেশীর ভাগ কুটির-শিল্পদ্রব্যের বিক্রি স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রদেশের সকল জায়গায় বিক্রির জন্য আমদানি হয়, কুটির-শিল্পের এমন জিনিসের সংখ্যা খুবই কম। গোটা ভারতবর্ষে কাটতি আছে, বা, বিদেশেও বিক্রির জন্য রপ্তানি হয়, এমন শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা আরও কম। আমাদের চেষ্টা করতে হবে কুটির-শিল্পের এই সঙ্কীর্ণ বিক্রয়-কেন্দ্রকে আরও বাড়িয়ে তোলার। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার কলকাতায় তাঁদের শিল্পদ্রব্যের প্রচার ও বিক্রয়-কেন্দ্র খুলেছেন, তাতে শুধু বাংলাদেশ কেন, পর্যটকদের মারফতে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও কাশ্মীরী শিল্পের প্রচার ও বিক্রয় বেড়ে যাবার কথা। কলকাতায় মাদ্রাজ সরকারের তাঁত-শিল্পের বিক্রয়-কেন্দ্র অল্পকালের মধ্যেই বাংলাদেশে জনপ্রিয় উঠেছে। কুটির-শিল্পদ্রব্যের প্রচার ও

বিক্রির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানাপ্রকারে চেষ্টা করছেন। কলকাতায় কুটির-শিল্পের সরকারী সংগ্রহশালা (Museum) রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং মধ্যে মধ্যে কুটির-শিল্প-প্রদর্শনী সংগঠন করে কুটির-শিল্পের ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা চলছে।

কুটির-শিল্পদ্রব্যের প্রচার এবং উৎকর্ষসাধনের চেষ্টায় জাপানের ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা দরকার। জাপানের অধিকাংশ শহরে শিল্প-গবেষণাগার রয়েছে, সেখানে কুটির-শিল্পের নূতন নূতন ডিজাইন ও কর্ম-কৌশল সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। কিন্তু জাপান শুধু নিজের দেশের গবেষণা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে না। প্রত্যেক শহরে যেখানে বিদেশী পর্যটকদের ভিড় হয়, সেই সব স্থানে, বিশেষ করে ভ্রমণকারীদের যাতায়াতের স্টেশনে, জাপানের কুটির-শিল্পের একটি প্রদর্শনী বা সংগ্রহশালা (museum) স্থাপন করা হয়েছে। এইসব সংগ্রহশালায় দর্শকদের জন্য 'মন্তব্য বই' রাখা হয়, দর্শকদের অনুরোধ করা হয়, যে সব শিল্পদ্রব্য তাঁরা দেখলেন, ঐগুলি সম্বন্ধে তাঁদের মতামত এবং কি উপায়ে জিনিসগুলি আরও ভাল করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তাঁদের উপদেশ তাঁরা যেন মন্তব্য-বইখানিতে লিখে রেখে যান। বলা বাহুল্য যে, এই উপায়ে জাপানের কুটির-শিল্প বিদেশীর কাছে পরিচিত হয় এবং বিদেশের বাজারে তার চাহিদা সৃষ্টি হয়। জাপানের কুটির-শিল্প সম্পর্কে আমরা আর-একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছি।

বাজারের চাহিদার গোড়ার কথা হল জিনিসের উৎকর্ষ ও উপযোগিতা (quality and ulility), এবং এই উৎকর্ষের কথা আলোচনা করতে গেলেই নিচের দুটি বিষয় এসে পড়ে,—

(১) উৎপাদনে নৈপুণ্য ও বিশেষ শিক্ষা

(২) কুটির-শিল্পে যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার

এ যুগের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী গতানুগতিক কুটির-শিল্পকে আধুনিক করতে গেলে দেশের মধ্যে বহু শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র, শিল্প-গবেষণাগার ও শিল্প-বার্তা-সরবরাহ-কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন। সরকারের শিল্প-বিভাগ এইগুলি সংগঠনের দায়িত্ব নেবেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন 'ব্লক'গুলিতে শিল্প-শিক্ষা-কেন্দ্র ও গবেষণাগার খোলার কথা বলা হয়েছে। গ্রামের সাধারণ কারিগর তার মামুলী কাজের রোজগারে কোন উৎসাহ পায় না। কি উপায়ে অল্প সময়ে আগের চেয়ে সে বেশী জিনিস উৎপাদন করতে পারে এবং গ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়ে তার উৎপন্ন জিনিস বাইরে বিক্রির ব্যবস্থা হতে পারে তা সে জানে না। গতানুগতিক গ্রাম-শিল্প ছাড়া নূতন কি লাভজনক কুটির-শিল্প তার গ্রামে চালু করা যায় সে খবর সে রাখে না। কুটির-শিল্পের উৎকর্ষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার তার ধারণার অতীত। গ্রাম-শিল্পীর এই একক, অনভিজ্ঞ ও বিচ্ছিন্ন শক্তিকে উন্নত প্রণালীতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সমাজ-উন্নয়ন ব্লকের শিক্ষা-কেন্দ্রে কুটির-শিল্পে আধুনিক

টেকনিক ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হবে। ব্লকের শিল্প-গবেষণাগার থেকে গ্রামের কর্মীদের শিল্প সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি সরবরাহ করা হবে এবং তাদের সমস্যা ও প্রশ্নগুলির যথাসম্ভব উত্তর দেওয়া হবে। সমাজ-উন্নয়ন ব্লকের গ্রাম-সেবকগণ সরকারী গবেষণাগার ও সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে এই কাজে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

এই ধরনের গবেষণাগার ও শিল্প-সংবাদ সরবরাহকেন্দ্র (Cottage Industry Research Institute & Cottage Industry Information Service) প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে একটি করে স্থাপিত হওয়া দরকার। ভারত সরকার কুটির-শিল্প গবেষণা পরিচালনার জন্য All India Research Institute গঠন করেছেন। পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য সরকার কর্তৃকও State Research Institute স্থাপনের কথা বলেছেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির-শিল্পের শিক্ষা ও বিস্তারের জন্য দেশের মধ্যে অনেকগুলি Training-cum-production centre খোলা হয়েছে। এই সব কেন্দ্রে তরুণ শিক্ষার্থিগণকে নূতন নূতন শিল্পে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

উৎপাদনের হার বাড়িয়ে জিনিসের দাম কমাতে হলে কুটির-শিল্পে যতটা সম্ভব যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের পল্লীঅঞ্চলেও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। মাদ্রাজ, মহীশূর, পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলির পল্লীগুলির পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ

সরবরাহের কাজ গত কয়েক বছরে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর বাঁধ থেকে যে বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, তা থেকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বহুদূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। লোকসংখ্যা দশ হাজারের কম, অথচ বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এরূপ শহর বা গ্রামের সংখ্যা ৬৫০০ থেকে বেড়ে ১৬,৫৫০ গিয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও বিস্তারের কাজে ৪২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে ৭৫ কোটি টাকা শুধু ছোট ছোট শহর ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যয় হবে। যে সব শহর এলাকায় বিশ হাজারের বেশী লোকের বাস, তাদের শতকরা ৯৫টিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে এবং জনবহুল পল্লীঅঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি বিস্তারের ফলে এই সব জায়গায় সহজেই যন্ত্রচালিত কুটির-শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কুটির-শিল্পে ধীরে ধীরে যন্ত্র আর সমবায় পদ্ধতি চালু করতে পারলে প্রচলিত কুটির-শিল্প শক্তিশালী ক্ষুদ্র শিল্পে রূপায়িত হয়ে উঠবে।

গ্রামের সাধারণ শিল্পীদের পক্ষে সমস্যা এই যে, কোন্ শিল্পে কি ধরনের যন্ত্র ব্যবহার হয়, সে যন্ত্র কোথা থেকে পাওয়া যায় এবং যন্ত্র পাওয়া গেলেও তাকে কিভাবে কাজে ব্যবহার করতে হয়, এর কোনটাই তারা জানে না। তারপর, দরিদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যন্ত্রপাতি কিনবার টাকাই বা কোথায়?

ভারত সরকার এই সমস্যাগুলি নিরসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা কুটির-শিল্প ও সরকারী সহযোগ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি। এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, ভারত সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ কুটির-শিল্পে অগ্রগামী রাষ্ট্রগুলির অনুকরণে ভারতীয় কুটির-শিল্পে যন্ত্র প্রবর্তনের কথা চিন্তা করছেন। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের পুনর্বাসন এবং শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের দুইজন প্রতিনিধি জাপানের কুটির-শিল্প পর্যবেক্ষণের জন্য জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁরা জাপান থেকে কিছু যন্ত্রপাতি খরিদ করেন এবং সেখানকার কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে একটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ বিবরণ দাখিল করেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-সচিব ও শিল্প-অধিকর্তা অনুরূপ উদ্দেশ্যে জাপানে চলেছেন। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রথম দিকে আমাদের বিদেশ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। পরে, আমাদের বৃহৎ শিল্পগুলি এই সব যন্ত্রপাতি নির্মাণের দায়িত্ব নিতে পারবে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বেসরকারী কুটির-ও ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এই সব যন্ত্র সংগ্রহ করতে পারবে এবং এজন্য তাদের দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ঋণ দেওয়া হবে।

বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার সমস্যা আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, যে সাতটি শ্রেণীতে আমাদের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ভাগ করা হয়েছে তার প্রথম চারটি সম্পর্কে এই সমস্যা বিশেষ নাই। শেষের তিনটি ক্ষুদ্র শিল্পের এই সমস্যা

সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন-কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারাই এই সমস্যার সহজ মীমাংসা হতে পারে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের পরিকল্পনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের 'Common Production Programmes' এর ভিতর দিয়ে এই সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে Common Production Programme কার্যকরী করতে নিম্নলিখিত উপায়গুলির একটি বা তার বেশী দরকার হতে পারে :—

(১) বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া,

অথবা, কতকগুলি দ্রব্য শুধু ক্ষুদ্র শিল্পেই উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট করা।

এই উপায়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের সহযোগী বা পরিপূরক শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা যায়। পূর্বে উল্লিখিত কুটির-ও ক্ষুদ্র শিল্প-তালিকার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিল্পগুলি এই ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে উৎপাদনের স্বার্থে এবং ব্যবসাগত বুঝাপড়ার ফলে বেসরকারী-ভাবে এরূপ সহযোগিতার সৃষ্টি হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমেরিকার বড় বড় মোটর কারখানার কর্তৃপক্ষ তাঁদের গাড়ির সমস্ত অংশ নিজেদের কারখানায় তৈরি করেন না, গাড়ির বহু অংশ তাঁরা বাইরের ছোট ছোট কারখানা থেকে খরিদ করেন। এই কারখানাগুলি 'ফোর্ড', 'জেনারেল মোটর' প্রভৃতি বড় বড়

মোটর কোম্পানির সহযোগী শিল্প হিসাবে চলছে।

অন্য দেশের তুলনায় জাপানের সাইকেল চূড়ান্ত সস্তা। তার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে সাইকেলের বিভিন্ন অংশ-গুলি বহুসংখ্যক কুটির-শিল্পে তৈরি হয়। যে সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি বাজার ছেয়ে ফেলেছে, তারও ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি পৃথক পৃথক কুটির-শিল্পে তৈরি হয়ে আসে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সুগঠিত হলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা বৃহৎ শিল্পের সহযোগী শিল্প হিসাবে কাজ করতে পারবে।

(২) ভারত সরকারের অর্থে ও পরিচালনায় যে মৌলিক শিল্পগুলি (Basic Industries) সংগঠিত হচ্ছে, তার কয়েকটির উৎপাদন-কাজ কুটির-শিল্পের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া।

(৩) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগতে না দেওয়া। যেমন, হস্তচালিত তাঁত ও খাদি শিল্পের স্বার্থে মিলের কয়েক প্রকার কাপড় তৈরি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থে এই উপায় গ্রহণ করবার আগে দেখতে হবে যে, বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন এই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি পড়বে কিনা, অর্থাৎ এই নিয়ন্ত্রণের ফলে জিনিসের দাম বেড়ে গিয়ে জনসাধারণ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

(৪) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বা শুল্ক আরোপ।

অনেক সময় কুটির-শিল্পে-তৈরি জিনিসের দামের সঙ্গে

বৃহৎ শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের দামের সমতা রক্ষা করতে এই ব্যবস্থার দরকার হয়।

(৫) কুটির-শিল্পের উৎপাদনে সরকারী তহবিল থেকে অর্থ সাহায্যদান (Subsidy) এবং কুটির-শিল্পে তৈরি জিনিসের বিক্রয়ের উপর সরকারী অর্থে কমিশন দেবার ব্যবস্থা।

প্রথম দিকে কুটির-শিল্পের সংরক্ষণে উপরের তিনটি ব্যবস্থা সাময়িকভাবে প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এর ফলে কুটির-শিল্প বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতায় সক্ষম এবং স্বাবলম্বী হতে যেন পিছিয়ে না পড়ে। এই ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা হতে কুটির-শিল্প যত শীঘ্র মুক্ত হতে পারে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

(৬) ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের দপ্তরগুলির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদকালে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যকে যতদূর সম্ভব প্রাধান্য দান—এই নীতি অনুযায়ী ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে বিভিন্ন দপ্তরের দরকারে তাঁরা যে বস্ত্র খরিদ করবেন, তার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হবে হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্র। ভারত সরকার রাজ্য সরকার-সমূহকেও এই নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন।

কুটির-শিল্পের সমস্যাগুলির মোটামুটি আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, এগুলির সমাধান সম্ভব এবং সরকার সমাধানের জন্য যত্নশীল। সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগ পাওয়া গেলে অল্পকালের মধ্যেই আধুনিক উন্নত প্রণালীতে পুনর্গঠিত হয়ে আমাদের কুটির-ও ক্ষুদ্র-শিল্প দেশের

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। কিন্তু সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের এই সক্রিয় সহযোগ একক বা বিচ্ছিন্ন ভাবে ততটা কার্যকরী হয় না। একক কুটির-শিল্পীর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে দেরি বা অসুবিধা হতে পারে, ফলে সে নিরুৎসাহ হয়ে ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু, যেখানে শিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিল্প-সমবায় গড়ে তুলেছে, সেখানে সরকার সহজেই সেই সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পীদের সংস্পর্শে আসতে পারেন এবং তাদের কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারেন। সুতরাং কুটির-শিল্পের পুনর্গঠনের গোড়াতেই প্রয়োজন শিল্প-সমবায় সংগঠন। সমবায়ের কথা পরবর্তী প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছি।

সমবায় ও সমাজ-উন্নয়ন

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের আদর্শ। এই আদর্শে লক্ষ্য রেখেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংগঠনে সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের কথা ভাবতে হবে। জীবদেহের একটি অঙ্গ অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তুলনায় অস্বাভাবিক ফেঁপে উঠলে অথবা শুকিয়ে ক্ষীণ হলে সেটা যেমন সুস্থতার লক্ষণ নয়, বরং গোটা জীবটির জীবন তাতে পঙ্গু হয়, সমাজদেহের বেলায়ও ঠিক তাই। সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্মক্ষমতা ও তৎপরতার উপর নির্ভর করছে গোটা রাষ্ট্রের শক্তি ও সমৃদ্ধি। এ যুগের জীবনযাত্রা এত জটিল যে, পরস্পরের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা ছাড়া কেউ একা চলতে পারে না। ব্যক্তিস্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতএব রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হল সমাজের সর্বাত্মক বা সার্বজনীন কল্যাণ সাধন।

ভারতে ৩,০১৮ শহর ও ৫,৫৮,০৮৯ গ্রাম আছে। ১৯৫১ সালের গণনায় আসামের উপজাতি অঞ্চল এবং জম্মু ও কাশ্মীর বাদে ভারতের লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৫,৬৮,৭৯,৩৯৪। জম্মু ও কাশ্মীরের লোকসংখ্যা হবে আনুমানিক ৪৪ লক্ষ এবং আসামের উপজাতি অঞ্চলে আনুমানিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোক বাস করে।

ভারতের এই বিরাট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১৭'৩ জন শহরে বাস করে, বাকি ৮২'৭ জন বাস করে গ্রামে। অতএব ভারতীয় সমাজের কল্যাণের কাজ হবে গ্রামকে কেন্দ্র করে। গ্রামের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা কমিশন 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা' (Community Development Project) গ্রহণ করেছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাশাপাশি প্রায় একশখানি গ্রাম নিয়ে এক-একটি সমাজ উন্নয়ন-কেন্দ্র (Community Development Block) অথবা জাতীয় সম্প্রসারণ-কেন্দ্র (National Extension Block) গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে বা ব্লকে কার্যপরিচালনার জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী থাকবেন এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিভাগের কর্মচারিগণ তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন। এক-একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে সেখানকার জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এবং বিভাগীয় কর্মচারিগণের মিলিত চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যে ঐ এলাকার গ্রামগুলির শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি সাধন করাই এরূপ ব্লক গঠনের উদ্দেশ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে, ভারতে ৩০০টি Community Development Block ও ৯০০টি National Extension Blockএ কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই সব ব্লকের অধীন গ্রাম ও লোক-সংখ্যা হচ্ছে এইরূপ :—

উন্নয়ন-কেন্দ্র (১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৫৫-৫৬)	ব্লকের বা কেন্দ্রের সংখ্যা	কেন্দ্রের এলাকাভুক্ত গ্রামের সংখ্যা	লোকসংখ্যা
১। সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (Community Development Block)	৩০০	৩২,৯৫৭	২০৪ লক্ষ
২। জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র (National Extension Block)	৯০০	৯০,০০০	৫৯৪ লক্ষ
মোট	১২০০	১,২২,৯৫৭	৭৯৮ লক্ষ

উপরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের মোট গ্রামগুলির প্রায় চার ভাগের এক ভাগ সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ-কেন্দ্রের এলাকাভুক্ত হয়েছে। স্থির হয়েছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ভারতের বাকি গ্রামগুলিতে জাতীয়-সম্প্রসারণ সেবা-পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩৮০০টি নূতন জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক খোলা হবে, এবং এর মধ্যে ১১২০টি ব্লককে পরে সমাজ-উন্নয়ন ব্লকে (Community Development Block) পরিণত করা হবে। জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক এবং সমাজ-উন্নয়ন ব্লক, উভয়ের কার্যধারা একই, তবে সমাজ-উন্নয়ন ব্লকগুলিতে উন্নয়ন-কাজগুলির জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উভয় শ্রেণীর ব্লকগুলির কাজের জন্য ২০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং এই

টাকা মোটামুটি হিসাবে নিম্নলিখিতভাবে খরচ হবে :—

		কোটি টাকা
(১)	ব্লকের কর্মচারী-বেতন, অফিস খরচ, ও আসবাবপত্র	৫২
(২)	কৃষি (পশুপালন, কৃষি-সম্প্রসারণ, পতিত জমি উদ্ধার ও ছোট ছোট সেচকার্য)	৫৫
(৩)	রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা	১৮
(৪)	গ্রাম-শিল্প	৫
(৫)	শিক্ষা	১২
(৬)	সমাজ-শিক্ষা	১০
(৭)	চিকিৎসা ও গ্রামের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা	২০
(৮)	গৃহনির্মাণ	১৬
(৯)	বিবিধ	১২
	মোট	২০০ কোটি টাকা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, প্রভৃতি খাতে পৃথক পৃথক ভাবে মোটা টাকা বরাদ্দ তো রয়েছেই : তার উপরে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেবার জন্য এই টাকাগুলি ব্লকগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মারফতে খরচ হবে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন যে, এর ফলে গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, গ্রামের কৃষিসম্পদ বাড়বে এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি দেখা যাবে—

(১) সমবায় চাষ এবং অন্যান্য কাজেও সমবায় পদ্ধতির বিস্তার।

(২) গ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠন—গ্রাম-উন্নয়নের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিয়ে পঞ্চায়েত কাজ করবে।

রাজ্যসরকারসমূহ নিজ নিজ প্রদেশের জন্য পঞ্চায়েত আইন পাস করেছেন এবং গ্রামের শাসন ও উন্নয়ন ব্যাপারে বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব পঞ্চায়েতকে দিয়েছেন। গ্রামের অভিজ্ঞ কৃষক, সমাজকর্মী এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধিগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত বা মনোনীত সভ্য হিসাবে থাকবেন। রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রামের ভূমিরাজস্বের একটি অংশ (শতকরা ১৫ থেকে ২০ টাকা এবং সম-পরিমাণ স্থানীয় অর্থ সংগ্রহের শর্তে আরও শতকরা ১৫ টাকা) গ্রামের উন্নয়ন-কাজে পঞ্চায়েতকে দেবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করেছেন।

(৩) গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি যাতে ভাল ভাবে কাজ করতে পারে এজন্য গ্রামগুলিরও পুনর্বিন্যাস দরকার। ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা ৫৫৮০৮৯। এর মধ্যে ৫০০ লোকের কম বাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা ৩,৮০,০২০; ৫০০ থেকে ১০০০ লোক বাস করে এমন গ্রামের সংখ্যা ১,০৪,২৬৮। পরিকল্পনা কমি-শনের মতে আর্থিক সঙ্গতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে পঞ্চায়েতের কাজের সুব্যবস্থা করতে গেলে প্রতি গ্রামের জন্য এক হাজার বা তার কাছাকাছি লোকসংখ্যা নিয়ে গ্রামগুলিকে পুনর্গঠন করা আবশ্যক।

কৃষি-কাজের সুবিধার জন্য আবাদী জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-গুলিরও একত্রীকরণ প্রয়োজন। জমিদারি-প্রথা বিলোপ ও ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে এ কাজের কিছুটা সুবিধা হয়েছে। কোন জমি পতিত থাকলে অথবা ঠিকমত চাষ না হলে সরকার থেকে সে জমি চাষের বিধি হয়েছে। এই সব জমি এবং জমিদারি ও মধ্যস্বত্ব-প্রথা বিলোপের ফলে জমিদার ও জোতদারদের নিকট থেকে পাওয়া বাড়তি জমি গ্রাম-পঞ্চায়েতের পরিচালনায় সমবায় প্রথায় চাষ হতে পারে। গ্রামের ছোট-বড় কৃষকেরা এই সমবায় চাষে যোগ দিতে পারে।

(৪) গ্রাম-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়ন।

(৫) ভূমিহীন কৃষক, খেত-মজুর, সাধারণ অশিক্ষিত শ্রমিক বা কারিগর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্রশ্রেণীর গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজের ব্যবস্থা।

(৬) গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা ও কাজের সংস্থান।

সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এর সফলতা প্রধানত নির্ভর করছে গ্রামের লোকের সমবায় প্রথার কার্যকলাপের উপর। কৃষি হচ্ছে গ্রামের লোকের প্রধান উপজীবিকা। তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়নে সর্বপ্রথম জোর দেওয়া হয়েছে সমবায় চাষের উপর। উন্নয়ন ব্লকের কর্মী এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভ্যগণ জনসাধারণের মধ্যে সমবায় সমিতির নীতি ও উপযোগিতার কথা প্রচার করবেন। সমবায়-চাষের সুযোগ ও সুবিধা গ্রামের লোককে

প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝাবার জন্য প্রত্যেক জাতীয় সম্প্রসারণ বা সমাজ-উন্নয়ন ব্লকে একটি করে সমবায় খামার (Co-operative farm) গড়ে তুলতে হবে। জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেবার দরুন জমিদার ও জোতদারদের উদ্‌বৃত্ত জমি সরকার সমবায়ের ভিত্তিতে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে পারেন। যে সকল নষ্ট জমি (Waste land) বা পতিত জমি উদ্ধার হয়ে সরকারের দখলে আসবে সেগুলিও সমবায় চাষের শর্তে চাষীদের মধ্যে বিলি হতে পারে। সুতরাং এই সমস্ত জমি এবং তার সঙ্গে গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি বলে গণ্য জমিগুলি দিয়ে গ্রামের প্রথম সমবায় খামার গড়ে উঠতে পারে। ধীরে ধীরে ছোট ছোট কৃষকদের জমির খণ্ডগুলিও এই সমবায় খামারের সঙ্গে যুক্ত হবে। পরে গ্রামের সমস্ত কৃষকদের জমি নিয়ে একটি শক্তিশালী সমবায় খামার সৃষ্টি হতে পারে।

আমাদের দেশের কৃষক সমাজে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সমবায় ঋণদান সমিতির (Co-operative credit society) ভিতর দিয়ে। দরিদ্র, অশিক্ষিত কৃষক চড়া সুদে মহাজনের কাছে টাকা কর্জ নেয়। দেনার দায়ে তার জমি ও জমির ফসল মহাজনের কবলে গিয়ে পড়ে। মহাজনের কবল থেকে কৃষককে রক্ষা করতে সরকারী ব্যবস্থায় সমবায় ঋণদান সমিতি গঠিত হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরের চেষ্টায় ভারতে মাত্র ২ লক্ষ ১৯ হাজার সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার হচ্ছে কৃষি সমবায় সমিতি। কিন্তু কৃষি সমবায় সমিতিগুলির ১ লক্ষ ৪৩ হাজারই হল

সমবায় ঋণদান সমিতি। কাজেই এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে কৃষি সমবায় সমিতি বলতে প্রধানত সমবায় ঋণদান সমিতিই বুঝায়।

সারা ভারতের কৃষকের প্রয়োজনের তুলনায় এই অল্পসংখ্যক সমবায় ঋণদান সমিতি চাষের কাজে অতি সামান্য অর্থই কৃষককে যোগাতে পারে। তারপর, অশিক্ষিত কৃষক মিতব্যয়িতা জানে না। ঋণদান সমিতির টাকা নিয়ে অনেক সময়ে সে চাষ ছাড়া অন্য কাজেও অযথা খরচ করে ফেলে। ফলে, তার ঋণের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ঋণের টাকা সময়মত আদায় না হওয়ায় অনেকগুলি সমবায় ঋণদান সমিতির কাজ বন্ধ হয়েও গিয়েছে। সুতরাং মহাজনের কবল থেকে কৃষক আজও মুক্ত হতে পারে নি। ঋণ শালিশী আইন পাশ করে কৃষকের ঋণের ভার কমাতে চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সে সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। মহাজনী আইন পাশ করে লগ্নী টাকার সুদের হার বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নিরুপায় কৃষক মহাজনের কাছ থেকে টাকা কর্জ নেবার কালে এ আইনের সাহায্য নিতে পারে না।

আসল কথা এই যে, সমবায় ঋণদান সমিতি থেকে কৃষককে শুধু ঋণ দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়—দেখতে হবে যে, কৃষকের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে কি না এবং চাষের কাজে মূলধনের প্রয়োজনে সে ঋণ করলেও সে ঋণ অনায়াসে শোধ দেবার সামর্থ্য তার আছে কি না। কৃষকের আয় বাড়াতে হলে কৃষির মূল দুটি বিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যথা—

(১) কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা

(২) উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা

অপেক্ষাকৃত কম খরচে বেশী উৎপাদন করতে হলে জমির সার, উৎকৃষ্ট বীজ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত প্রণালীতে চাষের কথা ভাবতে হবে। এর জন্য প্রচুর মূলধনেরও প্রয়োজন। একমাত্র সমবায় কৃষি উৎপাদন সমিতি গঠনের দ্বারাই কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির সুব্যবস্থা হতে পারে।

উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থাটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নূতন ফসল উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই গরীব চাষী টাকার দায়ে তা অল্প দামে ব্যাপারীর কাছে বেচে দিতে বাধ্য হয়। দু-তিন হাত বদল হয়ে এই ফসল শেষে গিয়ে পৌঁছায় কুঠিয়ালের ঘরে এবং কুঠিয়াল তা নিজের গোলায় রেখে সময়মত চড়া দামে বাজারে বিক্রি করে। ফলে, চাষের কাজে চাষীর চেয়ে ব্যাপারী ও মহাজনেরাই লাভবান হয় বেশী। এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে কৃষকদের সংঘবদ্ধ হয়ে সমবায় বিক্রয়-সমিতি গঠন করা দরকার। কৃষকেরা তাহলে ফসল নিজেদের সমিতির গোলাঘরে তুলে সুযোগমত উপযুক্ত দরে বাজারে বিক্রি করতে পারবে। ব্যাপারী ও মহাজনেরা যে মুনাফা পেত, তার অনেকখানি তখন কৃষকের ঘরে আসবে। সমবায় বিক্রয়-সমিতির এই কাজে যে অর্থের প্রয়োজন হবে সমবায় ঋণদান সমিতির তহবিল থেকে তা সরবরাহ করা হবে; অতএব বিক্রয় সমিতির সঞ্চিত ফসল বাজারে বিক্রি হবার আগেই সমিতি ফসলের বিনিময়ে কৃষকদের দরকারমত

টাকা যোগাতে পারবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সব বিক্রয়-সমিতির পণ্য রাখবার জন্য বিভিন্ন স্থানে গোলাঘর বা গুদামঘর তৈরি করতে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতের কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ৬৫০০টি উৎপাদন সমিতি, ১৪;১৮৪টি উৎপাদন ও বিক্রয় সমিতি এবং ৪,১৫০টি পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি ছিল। এদের মধ্যে সমবায় যৌথ চাষ সমিতির সংখ্যা আরও কম,—মাত্র ১২৪৭টি। যৌথ চাষের দ্বারা গণতান্ত্রিক চীনে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সেখানে ১৯ লক্ষ যৌথ খামারে কৃষিকাজ হয়। কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের পল্লীতে পল্লীতে যৌথ খামার গঠিত হওয়া দরকার।

কুটির-শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে গ্রামের সমবায় কৃষি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হল। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা কমিশন কৃষি-সমবায়ের মধ্য দিয়েই গ্রাম-শিল্পকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কমিশন আশা করেন যে, গ্রামের ছোট-বড় কৃষকেরা ধীরে ধীরে একটি কৃষি সমবায় সমিতির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হবে। এই সমবায় সমিতি গ্রামের চাষীদের সব রকম কাজের দায়িত্ব নেবে, অর্থাৎ যৌথ চাষ, উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থা, সমস্তই এই সমবায় সমিতির কাজ হবে। গ্রামের কৃষি সমবায় সমিতি এরূপভাবে সুগঠিত হলে, গ্রাম-শিল্পকে এই সমিতির পরিচালনায় সংগঠিত করা যাবে। কৃষি সমবায় সমিতির দ্বারা যৌথ-চাষ আরম্ভ হলে গ্রামের কিছু কৃষককে চাষ ছাড়া অন্য কাজ দিতে হবে। তখন বাধ্য হয়েই

কৃষি সমবায় সমিতিকে কৃষির সঙ্গে গ্রাম-শিল্পেরও সংগঠন ও উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশন এইখানে গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে খাঁটি সমাজতান্ত্রিক রূপ দিতে চেয়েছেন, অর্থাৎ কমিশন আশা করেন যে গ্রামের এই কৃষি সমবায় সমিতি কালক্রমে একদিন সর্বার্থসাধক সমবায় গ্রাম-সমিতির রূপ নেবে। গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী সমবায় গ্রাম-সমিতির সভ্য হবে। গ্রামের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, পঞ্চায়েত প্রভৃতি সবরকম অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক ব্যবস্থার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সমবায় গ্রাম-সমিতি গ্রহণ করবে। সমিতির সভ্যেরা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সমবায় গ্রাম-সমিতির বেতনভোগী কর্মী বা শ্রমিক হিসাবে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হবে। বছরের শেষে সমস্ত কাজ থেকে খরচ বাদে সমিতির যে টাকা আয় হবে, সভ্যদের মধ্যে তা লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করা হবে। এই ধরনের সর্বার্থসাধক গ্রাম-সমিতি হল পরিকল্পনা কমিশনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে কিছু দেরী হতে পারে। কিন্তু এখন থেকেই এই পথে কাজ চালাতে হবে। ইতোমধ্যেই বাংলা দেশে এমন দু-একটি সর্বার্থসাধক সমবায় গ্রাম-সমিতি গড়ে উঠেছে, যেখানে সমিতির সকল সভ্যকে সমিতির বিভিন্ন কাজে খাটিয়ে তাদের প্রতিপালনের যৌথ দায়িত্ব সমিতি গ্রহণ করেছে।

সমবায়ের সুযোগ ও দুর্যোগ

মহাজনের চড়া সুদের দেনা থেকে কৃষককে রক্ষা করতে ১৯০৪ সালে ভারতে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ হয়। ১৯১২ সালে ঋণদান সমিতি ছাড়া উৎপাদন, বিক্রয়, বীমা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে আর একটি সমবায় আইন পাশ হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে সমবায় ব্যবস্থাকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৬ সালে Rural Banking Enquiry Committee গ্রামের প্রাথমিক সমবায় সমিতি-গুলিকে সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতিতে পরিণত করার জন্য সুপারিশ করেন। এর ফলে একই সমবায় সমিতি যাতে কৃষি, শিল্প, ক্রয়, বিক্রয় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে এজন্য সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি গঠন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

শহরে অনেক বড় বড় যৌথ প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Companies) আছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ অংশীদারের টাকা একত্র করে যৌথ প্রতিষ্ঠানের বিরাট মূলধন সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, গ্রাম বা শহরাঞ্চলের অল্পসংখ্যক লোক মিলে তাদের সামান্য মূলধন দিয়ে একটা বড় কাজ করবার জন্যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সরকার অর্থ, উপদেশ এবং বিশেষ সুযোগ দিয়ে সমবায় সমিতির কাজে সাহায্য করেন। সমবায় সমিতি গঠনের সরকারী নিয়মকানুনও যতদূর সম্ভব সহজ করা হয়েছে। কোনস্থানের কতকগুলি লোক মিলে নির্দিষ্ট কোন কাজের জন্য (যথা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, পুনর্বাসন

ইত্যাদি) যদি একটি সমবায় সমিতি গঠন করতে চায়, তবে তারা প্রথমে নিজেদের একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে তাদের সমিতির কি নাম হবে, সমিতি কি কাজ করবে, কত মূলধন হবে, কোন ঠিকানায় সমিতির অফিস থাকবে, কতখানি এলাকা (area) নিয়ে সমিতির কর্মক্ষেত্র হবে, সমিতির মূলধন কতগুলি অংশে (share) ভাগ হবে, প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য কত হবে এবং ঐ শেয়ারের টাকা কয় কিস্তিতে সভ্যগণকে পরিশোধ করতে হবে,—ইত্যাদি বিষয় স্থির করতে হবে। এই সভাতে প্রথম বৎসরের জন্য সমিতির পরিচালকগণও (Directors) নির্বাচিত হবেন। সাধারণত নয় জন পরিচালক নির্বাচিত হয়ে থাকেন, এঁদের মধ্যে একজন সমিতির সভাপতি (Chairman) এবং একজন সমিতির উপসভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচিত হন। প্রত্যেক জেলায় সমবায় সমিতিসমূহের অ্যাসিস্টাণ্ট রেজিস্ট্রারের অফিস আছে; সেখানে সমবায় সমিতির ছাপানো উপবিধি পাওয়া যায়। কৃষি সমবায়, ক্রয় ও বিক্রয় সমবায়, উদ্বাস্তু উপনিবেশ বা গৃহনির্মাণ সমবায় প্রভৃতি পৃথক পৃথক সমবায় সমিতির জন্য পৃথকভাবে ছাপানো উপবিধি আছে। যে সকল সমবায় সমিতি কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ বা ব্যবসায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সব রকম কাজের জন্য গঠিত হচ্ছে, তাদের জন্য সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতির উপবিধি আছে। নূতন সমিতি গঠন করতে অ্যাসিস্টাণ্ট রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে এই ছাপানো উপবিধি এনে তার ঘরগুলি পূরণ

করতে হবে, তারপর সমিতি রেজিস্ট্রি করবার জন্য সমিতির সভ্যগণ উপবিধিতে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে সমবায়ের অ্যাসিস্টাণ্ট রেজিস্ট্রারের অফিসে দাখিল করবেন। অতঃপর সমবায় সমিতিসমূহের ইন্‌স্পেক্টারের দ্বারা স্থানীয় পরিদর্শনের পর সমবায় সমিতি আইন অনুসারে অ্যাসিস্টাণ্ট রেজিস্ট্রারের অফিসে সমিতি রেজিস্ট্রি হবে। এই ভাবে রেজিস্ট্রি করতে সমবায় সমিতির কোন খরচ লাগে না। গ্রামের সাধারণ শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা অনায়াসে বিনাখরচায় সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের কাজের সুব্যবস্থা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ডায়মণ্ডহারবারের ঘাটে রোজ সকালে ও বিকালে জেলেরা মাছ মেরে এনে বিক্রির জন্য হাজির করে। ব্যবসায়ীরা এই মাছ কিনে নিয়ে বরফ দিয়ে তাদের লরিতে করে কলিকাতায় চালান দেয়। গরিব জেলেদের বরফও নেই, লরিও নেই; তাই তারা নিজেরা কলকাতায় মাছ পাঠাতে অক্ষম। ব্যাপারীরা তাদের মাছের যে দাম দেবে তাই তারা নিতে বাধ্য। কিন্তু দু শ' ঘর জেলে যদি প্রত্যেকে দশ টাকার শেয়ার কিনে একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে, তাহলে তাদের দু হাজার টাকা মূলধন হয়, সরকার এই সমিতিকে কাজ চালাবার জন্য বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারেন, তখন জেলেরা তাদের সমবায় সমিতি থেকে বরফ ও লরির ব্যবস্থা করে নিজেদের মাছ নিজেরাই কলকাতার বাজারে এনে বেশী দামে বেচতে পারে। অনেক জলকর ধনী ইজারাদারেরা সরকারের নিকট থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে

মাছের ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা লাভ করে। জেলেরা দিনমজুর হিসাবে ইজারাদারের জলকরে কাজ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইজারাদারকে অত্যন্ত চড়া হারে খাজনা দিয়ে তার জলকরে জেলেরা মাছ ধরবার অধিকার পায়। কিন্তু জেলেদের সমবায় সমিতি থাকলে সরকার অপেক্ষাকৃত কম টাকাতেই জলকর কোন ব্যক্তিগত' ব্যবসায়ীকে না দিয়ে জেলেদের সমিতিকেই বন্দোবস্ত দিতেন। এই ভাবে সমবায়ের সাহায্যে দেশের অন্যান্য শ্রমিক ও শিল্পীরা (যথা তাঁতশিল্পী, চর্মশিল্পী) তাদের ব্যবসাকে সুগঠিত করতে পারে।

সমবায় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য-সরকারসমূহ সমবায় সমিতিগুলিকে বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দিচ্ছেন, যথা, অল্প সুদে ঋণ ও অর্থ সাহায্য (loans & subsidies), যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল সরবরাহ এবং সমবায় কর্মীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা। হায়দরাবাদ সরকার কৃষি সমবায় সমিতিগুলিকে জমির খাজনা ও কৃষি আয়কর কমিয়ে দিয়ে অথবা কৃষি আয়কর থেকে একেবারে অব্যাহতি দিয়ে উৎসাহিত করছেন। পরীক্ষামূলকভাবে বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, অন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র ভূপাল, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে সমবায় যৌথ চাষ আরম্ভ হয়েছে।

সমবায়ের সুযোগের কথা অনেক বলা হল, এবার তার দুর্যোগের কথা কিছু বলা যাক। সমবায়ের কাজে এযাবৎ আমরা আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারি নি। গত পঞ্চাশ

বছরে দেশে এমন বহু সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে, যাদের কাজ কিছুদিন বেশ চলেছে, তারপর, উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে অথবা সভ্যগণের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ফলে, সমিতির টাকা পয়সা নষ্ট হয়েছে, শেষে মূলধনের অভাবে সমিতির কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সমিতি লোপ পেয়েছে। সমবায় সমিতির এরূপ দুর্যোগের মূল কারণগুলি ও তাদের প্রতিকার সম্পর্কে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি—

(১) পল্লীর অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। দুচারজন শিক্ষিত লোক অগ্রণী হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করেন, কিন্তু সভ্যদের অধিকাংশেরই সমবায় সমিতির কাজ, কর্ম বা হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে দুদিক থেকে বিপদ এসে উপস্থিত হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমিতির প্রথম সংগঠনকারিগণ বা পরিচালকবর্গ হয়তো খুবই সৎ, শিক্ষিত এবং সমিতির কাজে অভিজ্ঞ। সমিতির কাজ তাঁদের হাতে ভালভাবে গড়ে উঠবার পর দুএকটি ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্বেষী সভ্য তাঁদের সরিয়ে নিজেরা কর্তৃত্ব করবার জন্য সভ্যদের মধ্যে দল পাকাতে সুরু করল। সাধারণ অশিক্ষিত সভ্যের দল তাদের মিথ্যা প্রচারে ভুলে হয়তো ভাল লোকগুলিকেই সমিতির পরিচালনা হতে সরিয়ে দিল। ফলে সমিতি ধ্বংসের মুখে চলল।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, সমিতির পরিচালকেরা চতুর ও স্বার্থপরায়ণ। সভ্যদের অজ্ঞতা

ও উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে নানা অজুহাতে তারা সমিতির টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে সমিতিও ডুবল।

(২) উপরে বর্ণিত অবস্থা থেকে সমবায় সমিতিকে বাঁচাতে সরকার সমবায় আইনে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রতিবৎসর সভ্যদের সাধারণ সভায় সমিতির পরিচালকগণ (Directors) নির্বাচিত হন। সমিতির পরিচালক সভায় (Board of Directors) যাতে যোগ্য লোকের অভাব না হয়, এজন্য সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার নির্বাচিত পরিচালকগণের সঙ্গে তাঁর মনোনীত তিনজন পরিচালক (Nominated Directors) দিয়ে পরিচালক সভা গঠন করতে পারেন। এই তিনজন মনোনীত পরিচালক সমিতির অংশীদার (Shareholder) নাও হতে পারেন। রেজিস্ট্রার সাধারণত স্থানীয় সরকারী কর্মচারী বা বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোনয়ন করে থাকেন।

পূর্বে পরিচালকগণের ভিতর থেকেই সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হত; কিন্তু বর্তমান আইনে সমবায় সমিতির সেক্রেটারীকে সমিতির বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, সেক্রেটারী সমিতির বিশেষ কোন দলভুক্ত না হয়ে নিরপেক্ষ কর্মচারী হিসাবে সমিতির কাজ দেখাশুনা করেন।

ইংরেজ আমলে প্রতি ত্রিশ সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষার জন্য একজন মাত্র হিসাব পরীক্ষক (Auditor)

নিযুক্ত হত, ফলে, অনেক সমিতির হিসাব সারা বছরের মধ্যে পরীক্ষা (Audit) হত না, এতে বহু সমিতির পরিচালনার ত্রুটি ও অসাধুতা সময়মত ধরা পড়ত না। সাধারণ ম্যাট্রিকুলেশন বা আই. এ. পাশ করা ব্যক্তিদের তখন হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করা হত। বর্তমানে হিসাব পরীক্ষার কাজে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্যতর ব্যক্তিদের সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষকের পদে নেওয়া হচ্ছে এবং হিসাব পরীক্ষকের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। প্রত্যেক সমবায় সমিতির হিসাবপত্র যথাসময়ে ঠিকমত পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) সমবায় সমিতি নষ্ট হবার আর একটি প্রধান কারণ সমিতির কাজে পরিচালক ও কর্মিগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব। কৃষি, শিল্প বা ব্যবসা, কোন কাজই কিছুদিন হাতেকলমে না শিখলে ভালভাবে সম্পন্ন করা যায় না সমবায় সমিতির পরিচালকেরা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের সমিতির কাজকর্মে অনভিজ্ঞ, ব্যবসায়ে তাঁরা নবাগত। ফলে, তাঁদের পরিচালনার ভুলত্রুটিতে সমিতির আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে।

গত মহাযুদ্ধের কালে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন জিনিসের (controlled goods) দোকান চালাবার জন্য অনেকগুলি সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারের সুযোগ নিয়ে এই সব সমিতি তখন বেশ চলছিল, কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠে

যাবার পর এরা আর ব্যবসায়ে সুবিধা করতে পারল না, কারণ স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে যে শ্রম, অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, এই সব সমিতির কর্মকর্তাদের তা ছিল না।

বর্তমানে অনেক সমবায় সমিতিকে বিভিন্ন রাস্তায় যাত্রীবাহী 'বাস' চালাবার অধিকার দেওয়া হচ্ছে। একাজে সমিতির লোকসান যাবার কোনই আশঙ্কা নেই, কারণ এটাও একচেটিয়া ব্যবসায়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, যে গ্রামের সমবায় সমিতিকে যানবাহন ব্যবসার এই বিশেষ সুযোগ বা অধিকার দেওয়া হচ্ছে সে গ্রামের সর্বসাধারণ যেন এই সমিতির সভ্য হবার সুযোগ পায়। অনেক ক্ষেত্রে মাত্র দুটি বা তিনটি পরিবারের আত্মীয় স্বজনের কুড়ি পঁচিশটি নাম দিয়ে একটি সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রি করে মোটর বাসে যাত্রী পরিবহন ব্যবসার সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারে,—এ ধরনের সমিতি সমবায়ের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে, কারণ, একটি গ্রাম বা সমাজের সাধারণ মানুষের সম্মিলিতভাবে শ্রম ও অর্থ উপার্জনের সুযোগ এতে থাকে না।

উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, দেশে সমবায় আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের জনসমাজে তিনটি গুণের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন, যথা,—

(১) একতা

(২) সততা

(৩) শিক্ষা

সমাজে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রবৃত্তি থেকেই সমবায় প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই একতা বেশীক্ষণ টিঁকে না, যদি মানুষের মধ্যে সততা না থাকে। আবার মানুষের মধ্যে এই একতা ও সততা-বোধ জাগাবার মূলে হল শিক্ষা। এই শিক্ষা শুধু আক্ষরিক শিক্ষা নয়, তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন মানুষের সমাজনৈতিক শিক্ষা বা সমাজ-শিক্ষা, যে শিক্ষার দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে তার সমাজ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় কল্যাণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। অবশ্য আক্ষরিক শিক্ষার ভিত্তির উপরেই মানুষের এই সামাজিক জীবন-বোধ বা সমাজ-শিক্ষা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের দেশে স্কুল কলেজের উচ্চ শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য অতি কম লোকেরই হয়েছে। তা বলে আমাদের নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই। পল্লীতে পল্লীতে বয়স্কদের মধ্যে সমাজ-শিক্ষা বিস্তারের বিরাট কর্মসূচী সরকার ও জনসাধারণ গ্রহণ করেছেন। দেশের অগণিত নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের এই ব্যাপক প্রচেষ্টার সফলতার উপরে একান্তভাবে নির্ভর করছে সমবায় আন্দোলনের সার্থকতা।

কুটির শিল্প ও সরকারী সহযোগ

জাতীয় পরিকল্পনায় গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প বিস্তারের উপরে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, এই ব্যাপারে আশানুরূপ ফল পেতে হলে গ্রামাঞ্চলে যে পরিমাণ ক্ষুদ্র শিল্প বিস্তারের আবশ্যক, তা করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। কাজেই প্রচলিত গ্রামশিল্পগুলির সংগঠন ও উন্নয়নের দিকেই অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গ্রামশিল্পগুলি ক্রমশঃ উন্নততর প্রণালীতে সংগঠিত হয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের পর্যায়ে এসে দাঁড়াতে পারবে। জাতীয় সরকার এই উদ্দেশ্যে গ্রামশিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে ভারত সরকার কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ছয়টি বোর্ড গঠন করেছেন—

(১) নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামশিল্প বোর্ড (All India Khadi and Village Industries Board)—খাদি এবং অন্যান্য গ্রামশিল্পের উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা, কর্মীদের শিল্পশিক্ষা, খাদি ও গ্রামশিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ, বিভিন্ন গ্রামশিল্পের আর্থিক সমস্যা

সম্পর্কে গবেষণা প্রভৃতি কাজের ভার এই বোর্ডের উপর দেওয়া হয়েছে।

(২) নিখিল ভারত তাঁত বোর্ড (All India Handloom Board)—হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য এই বোর্ড ভারত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। এই বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে সরকার তাঁত (handloom) শিল্পের জন্য অর্থসাহায্য মঞ্জুর করেন। বিদেশের বাজারে ভারতের তাঁতের কাপড়ের (handloom products) চাহিদা বাড়াতে ভারত সরকার কলম্বো, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর এবং বাগদাদে তাঁত বস্ত্র বিক্রয়ের অফিস খুলেছেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতীয় তাঁতীদের তৈরি জিনিসের নানারকম নমুনা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁতের কাপড়ের রপ্তানি বাণিজ্য নিখিল-ভারত তাঁত বোর্ডের মাধ্যমে ভারত সরকার সরাসরি ভাবে পরিচালনা করেন।

(৩) নিখিল ভারত হস্ত-শিল্প বোর্ড (All India Handicrafts Board)—হাতের কাজের জিনিসগুলির নূতন নূতন 'ডিজাইন' বের করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হচ্ছে। ভারতে এবং ভারতের বাইরেও যাতে এসব জিনিসের চাহিদা বাড়ে, এজন্য নানাস্থানে বিক্রয়কেন্দ্র, প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতি সংগঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতীয় কারিগরের তৈরি জিনিস পাঠানো হয়। সমবায় ব্যবস্থায় এই জিনিসগুলির বিক্রয় বাড়াবার চেষ্টা

চলছে। ধাতুর জিনিস, খেলনা, তালপাতার জিনিস, মার্বেল এবং পাথর খোদাই করে তৈরি মূর্তি, গালার জিনিস প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে নানা জায়গায় 'শিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র' (Training cum Production Centre) খোলা হয়েছে। নিখিল ভারত হস্ত-শিল্প বোর্ড এইসব কাজে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেন।

(৪) নিখিল ভারত রেশমশিল্প বোর্ড (All India Silk Board)—রেশম চাষের প্রসার, রেশম দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থা, উন্নততর রেশম শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণা প্রভৃতি বিষয় এই বোর্ড পরিচালনা করেন।

(৫) নিখিল ভারত তন্তু শিল্প বোর্ড (All India Coir Board)—নারিকেলের ছোবড়া বা অন্য কোন জাতীয় আঁশ বা তন্তু থেকে তৈরি দড়ি, পাপোষ, মাদুর, আসন প্রভৃতি শিল্প এই বোর্ড পরিচালনা করেন। বিদেশের বাজারে ভারতীয় তন্তু শিল্পের সমাদর ও চাহিদা বাড়াতে চেষ্টা চলছে।

(৬) নিখিল ভারত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (All India Small Scale Industries Board)—ক্ষুদ্র শিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কথা পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে পরিচালিত ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতি-

যোগিতায় টিঁকে থাকবার মত শক্তিশালী হবে এবং অনেক-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের সহযোগী শিল্প হিসাবে কাজ করতে পারবে, অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পের কারখানায় যে জিনিস প্রস্তুত হয়, তার বিভিন্ন অংশ ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানায় তৈরি করে বৃহৎ শিল্পকে সরবরাহ করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন কাজে উভয়ের মধ্যে এভাবে সহযোগিতা ও যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন 'সম্মিলিত উৎপাদন ব্যবস্থা' (Common Production Programme) সুপারিশ করেছেন। যে সকল ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে বৃহৎ শিল্পের সহযোগী (ancillary) শিল্প হিসাবে কাজ করা সম্ভব হবে না, বরং বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রি করতে হবে, তাদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারকে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে, যথা ঃ—

(ক) এক জাতীয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদন সুনির্দিষ্ট ভাবে ভাগ করে দেওয়া,—যেমন, হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে রক্ষা করতে কাপড়ের মিলগুলিকে কয়েক রকমের বস্ত্র উৎপাদনে নিষেধ করা হয়। এরূপ নিষেধাজ্ঞার ফলে হস্তচালিত তাঁতশিল্প এই ধরনের বস্ত্র উৎপাদনে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পায়।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া,—যেমন, বড় বড় কাপড়ের কলগুলিতে ব্যবহৃত টাকুর (spindles) সংখ্যা সরকার

নির্দিষ্ট করে দিয়ে মিলগুলির বস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন।

(গ) বৃহৎ শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা।

(ঘ) কুটির শিল্পের উৎপাদনে সরকারী তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য (subsidy) করা অথবা কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর সরকারী অর্থে কমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদকালে যতটা সম্ভব কুটির শিল্পজাত দ্রব্য খরিদ করা।

কুটির শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচাবার জন্য ভারত সরকারের শিল্পনীতিতে উপরিউক্ত বিশেষ ব্যবস্থাগুলির কথা বলা হয়েছে। কুটির শিল্পের বিস্তার ও রক্ষাকল্পে সাময়িকভাবে এই সব উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন এভাবে সীমাবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে কুটির শিল্পের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন কমিয়ে দিলে এবং তার উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর বসালে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই, এ ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা হতে মুক্ত হয়ে কুটির শিল্প যত শীঘ্র তার নিজের শক্তির উপর ভর করে দাঁড়াতে পারে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটির শিল্পকে আত্মনির্ভরশীল হতে হলে গোড়াতেই প্রয়োজন—

(১) প্রচলিত গ্রামশিল্পগুলিকে সমবায় ব্যবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ করা—(Co-operative Societies of Village Industries),

(২) বৈদ্যুতিক শক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা বহুসংখ্যক কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র শিল্পের স্তরে উন্নত করা,

(৩) কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য মূলধনের ব্যবস্থা করা,

(৪) কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প পরিচালনা সম্পর্কে গবেষণা, কারিকরদের শিক্ষাব্যবস্থা, বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা।

ভারত সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের এই প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) গঠন করেছেন। জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন দেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে ধারে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে এই সকল যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ করতে পারবে। দেশের সর্বত্র শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (All India Small scale Industries Board) নানাস্থানে ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা (Small Industries Service Institute) গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কলিকাতা, বোম্বাই

মাদ্রাজ (মাদুরাই) এবং দিল্লী (ফরিদাবাদ), এই চার জায়গায় চারটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা (Small Industries Service Institute) স্থাপিত হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই সংখ্যা বাড়িয়ে সারা ভারতে মোট কুড়িটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা গঠিত হবে স্থির হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণ সম্পর্কে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের যে গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তার অনেকখানি এই সকল ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার মারফত প্রতিপালিত হবে।

ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার কর্মসূচী

কলিকাতায় ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার বর্তমান ঠিকানা হচ্ছে,—৪ নং ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৬। বর্তমানে সমগ্র ভারতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান মাত্র চারটি স্থাপিত হয়েছে বলে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা তার পাশাপাশি কয়েকটি রাজ্য বা প্রদেশের শিল্প সংগঠনের কাজে সাহায্য করবে। কলিকাতার ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করবে।

প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার জন্য বিভিন্ন শিল্পে বিশেষজ্ঞ কর্মচারিগণ নিযুক্ত হয়েছেন। এই সকল বিশেষজ্ঞগণের প্রধান কাজ হল দেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান-

গুলিকে তাদের শিল্প ও ব্যবসা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচা মাল কিভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে, কি প্রণালীতে উৎপাদনের উন্নতি করা যেতে পারে, কি উপায়ে উৎপাদনের খরচা কমানো যায় এবং আরও ভাল জিনিস উৎপন্ন করা যায়, কোন জিনিসের কোথায় কি রকম চাহিদা আছে—ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্নের জবাব যে কোন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ঐ অঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা থেকে পেতে পারে।

ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার কাজ কেবল শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রশ্নের জবাব দিয়েই শেষ হয় না, দেশের মধ্যে নূতন নূতন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে গড়ে ওঠে সেজন্যেও তাকে কাজ করতে হবে। ভ্রাম্যমান মোটরগাড়িতে বিদ্যুৎচালিত ছোট ছোট যন্ত্র নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার কর্মীরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং কি ভাবে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কাঠের কাজ ও কামারশালের কাজ সহজে কম খরচায় করা যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত পল্লীর শিল্পীদের হাতেকলমে কাজ করে দেখান। যে কোন অঞ্চলের শিল্পীরা সংস্থার কর্তৃপক্ষকে এজন্য অনুরোধ করলে এই ভ্রাম্যমান গাড়ি নিয়ে সংস্থার কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হতে পারেন।

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা দেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধারে এবং সহজ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করবার ব্যবস্থায়

আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজে সাহায্য করে থাকে। সংস্থার কর্তৃপক্ষ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার এই সকল কাজগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

১। যন্ত্র-শিল্প সম্পর্কে সহায়তা

(১) কোন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পর্কে পরামর্শ

(২) উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ

(৩) ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণের যন্ত্র-শিল্পে শিক্ষা ব্যবস্থা

(৪) শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল সংগ্রহে সহায়তা

(৫) শিল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা

(৬) যন্ত্র-শিল্পঘটিত সমস্যাগুলির অনুসন্ধান ও সমাধান

২। শিল্প সংগঠন ও ব্যবসা সম্পর্কে সহায়তা

(১) কোন শিল্পের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণে সহায়তা

(২) উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় সমস্যার সমাধান

(৩) ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্প-সম্পর্কীয় সংবাদ পরিবেশন

(৪) ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ

(৫) চলতি মূলধন সংগ্রহে সহায়তা

(৬) শিল্প সংগঠনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন

(৭) বিশেষ কতকগুলি শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান ও আলোচনা

(৮) জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন হতে ধারে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যাপারে সহায়তা।

দেশের নানা ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য দানের জন্য প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থায় নিম্নলিখিত বিভাগগুলি রয়েছে :—

(১) যন্ত্র বিভাগ।

(২) ধাতুবিজ্ঞান বিভাগ।

(৩) বৈদ্যুতিক বিভাগ।

(৪) রাসায়নিক বিভাগ।

(৫) কাঁচ ও মৃৎশিল্প বিভাগ।

(৬) চর্মশিল্প বিভাগ।

(৭) অর্থনৈতিক বিভাগ।

(৮) ব্যবসা পরিচালনা ও বিক্রয় বিভাগ।

(৯) শিল্প উপনিবেশ বিভাগ।

(১০) দৃষ্টান্তমূলক শিল্প সংস্থাপন বিভাগ (Pilot Project Division)

শিল্প উপনিবেশ—(Industrial Estates) জনসাধারণকে ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন নূতন সম্ভাবনার পথ

প্রদর্শনের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার কর্তৃক কতকগুলি দৃষ্টান্তমূলক ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাপনের কথা বলা হয়েছে। এই সকল ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ছোট ছোট শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে পাশাপাশি গড়ে তোলা হবে। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কতকগুলি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হলে ঐ অঞ্চল একটি শিল্প উপনিবেশে (Industrial Estate) পরিণত হবে। পশ্চিমবঙ্গে কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী কল্যাণীতে এরূপ একটি শিল্প উপনিবেশ (Industrial Estate) গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন এলাকায় শিল্প উপনিবেশ সংগঠনের জন্য দশ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই সকল শিল্প উপনিবেশে শিল্প শিক্ষার জন্য পলিটেকনিক্যাল স্কুল, শিল্প গবেষণাগার এবং শিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র (Training-cum-Production Centre) স্থাপিত হবে। ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনের সমস্ত রকম সুবিধা, অর্থাৎ, কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র, বৈদ্যুতিক শক্তি, জল, গ্যাস, বাষ্প, মালপত্র আমদানি-রপ্তানির জন্য যানবাহনের সুবিধা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা—সব কিছুই শিল্প উপনিবেশে থাকবে। শিল্প উপনিবেশে ঐ অঞ্চলের বেকার লোকদের কর্মসংস্থান হবে। উপনিবেশের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পরিচালনা ও অর্থনৈতিক সাফল্য দেখে জনসাধারণ নূতন নূতন বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করবে। সরকারী অর্থে স্থাপিত দৃষ্টান্তমূলক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও ভালভাবে গড়ে উঠলে সেগুলি বেসরকারী পরিচালনায় ছেড়ে দেওয়া

হবে। জনসাধারণ শিল্প সমবায় সমিতি গঠন করে এই সব ক্ষুদ্র শিল্পের কর্তৃত্ব ও মালিকানা গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ব্যয়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তা মোটামুটি আলোচনা করা গেল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ৩১ কোটি টাকা। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে সরকার পক্ষে ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন কুটির শিল্পে এই টাকা নিম্নলিখিত ভাবে খরচ হবে—

১। হস্তচালিত তাঁত শিল্প—	কোটি টাকা
তুলা বস্ত্র বয়ন···	··· ৫৬·০
রেশম বস্ত্র বয়ন ··	··· ১·৫
পশম বস্ত্র বয়ন···	··· ২·০
	৫৯·৫
২। খাদি—	
পশম সূতা প্রস্তুত ও বয়ন···	··· ১·৯
কার্পাস সূতা প্রস্তুত ও খাদি···	··· ১৪·৮
	১৬·৭

৩।	গ্রাম শিল্প—	
	ঢেঁকি ছাটা চাউল প্রস্তুত কার্য…	… ৫·০
	তেলের ঘানি	… ৬·৭
	চর্ম শিল্প	… ৫·০
	গুড় শিল্প	… ৭·০
	কুটির শিল্পে তৈরি দেশলাই	… ১·১
	অন্যান্য গ্রামশিল্প	… ১৪·০
		৩৮·৮
৪।	হাতের কাজ (Handicrafts)	… ৯·০
৫।	ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small Scale Industries)	৫৫·০
৬।	রেশম শিল্প	… ৫·০
৭।	তন্তু শিল্প (Coir Spinning & Weaving)	১·০
৮।	General Schemes— বিভাগীয় পরিচালনা, শিল্প গবেষণা, শিল্প শিক্ষা ও উৎপাদনকেন্দ্র, বিক্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি	১৫·০
		২০০·০

উপরিউক্ত হিসাবের ২০০ কোটি টাকার মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের পরিচালনায় যে কার্যকরী মূলধন (working capital) প্রয়োজন হবে, তা ধরা হয় নাই। বর্তমানে প্রচলিত কুটির শিল্পের কার্যকরী মূলধনের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সুতরাং গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের সংগঠন

ও উন্নয়নে যে প্রচুর মূলধনের আবশ্যক হবে, তা সরবরাহ করার দায়িত্ব ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার Industrial Finance Corporation গঠন করেছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত Industrial Finance Corporation কর্তৃক বৃহৎ শিল্পগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সংগঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্য সরকার সমূহের। এ জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের খাতে যে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তারমধ্যে ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে রাজ্য সরকার সমূহের পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে। বাকী ২৫ কোটি টাকা ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে খরচ হবে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কার্যকরী মূলধন সংগ্রহের দায়িত্বও তাই রয়েছে রাজ্য সরকারের উপর। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশে এগারটি State Finance Corporation গঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে State Finance Corporation ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করে। এ ছাড়া National Small Industries Corporation (১৯৫৫) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ধারে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুযোগ দিয়ে এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্য ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নয়নে

সাহায্য করছে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ন্যাশনাল স্মল ইনডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের নিকট সরাসরি আবেদন করে অথবা ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার মাধ্যমে এই ধরনের সাহায্য পেতে পারে। কিন্তু কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সাধারণত রাজ্য সরকারের শিল্প অধিকারে (Directorate of Industries) আবেদন করতে হবে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন ও কাঁচা মাল সরবরাহ, কারখানা স্থাপনের জন্য জমি বা বাড়ি সংগ্রহ, আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তি ও জলের ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিষয়গুলির জন্য রাজ্যসরকারের শিল্প অধিকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার।

ক্ষুদ্র শিল্পকে কার্যকরী মূলধন সংগ্রহে ঋণ দেবার জন্য স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত কুটির বা গ্রাম শিল্পের কার্যকরী মূলধন প্রধানত সংগ্রহ হবে সমবায় ঋণদান সমিতি থেকে। প্রত্যেক রাজ্যে বা প্রদেশে কতকগুলি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্বাবধানে শহর ও গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি সমবায় ঋণদান সমিতি কাজ করে। এই সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করবার জন্য রাজ্যসরকার এই সকল সমিতির অংশীদার হিসাবে মোটা টাকা যোগান দেবেন। রাজ্যসরকার আবার এই টাকা সংগ্রহ করছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব

ইণ্ডিয়া, স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন্ করে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কার্যকরী মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে গ্রাম শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে রক্ষার জন্য ভারত সরকারের সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারত সরকার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ করে বৃহৎ শিল্পের কার্যকলাপ ও উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই আইনের বলে ভারত সরকার কতকগুলি বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে যথেচ্ছ বাড়তে না দিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিস্তার ও উন্নয়নে সাহায্য করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় যে গ্রাম শিল্পগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার কয়েকটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(১) ঢেঁকি ছাঁটাই চাউল—জনস্বার্থের খাতিরে বিশেষ প্রয়োজন না হলে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত নূতন কোন চাউলের কলের লাইসেন্স দেওয়া হবে না এবং চলতি কলগুলিতে ছাঁটাই চাউলের পরিমাণ বাড়াতে দেওয়া হবে না। এই ব্যবস্থায় ধান ভানার কাজে ঢেঁকির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

(২) জুতা তৈরির কুটির-শিল্প—জুতা তৈরির বড় বড় কারখানাগুলিতে উৎপন্ন জুতার সংখ্যা বাড়তে দেওয়া হবে না। বড় কারখানাগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা এভাবে নিয়ন্ত্রিত

হলে বাজারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি জুতার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

(৩) চামড়া তৈরির কাজে গ্রাম-শিল্প—বড় বড় ট্যানারিগুলির (Tanneries) উৎপাদন-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি পাকা চামড়ার চাহিদা বাড়াতে চেষ্টা করা হবে।

(৪) কুটির-শিল্পজাত দেশলাই—প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ ফ্যাক্টরিগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির উপরে বর্তমানে যে নিষেধাজ্ঞা আছে, ভবিষ্যতেও তা বলবৎ থাকবে। এই ব্যবস্থায় বাজারে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ফ্যাক্টরি-গুলিতে উৎপন্ন দেশলাইয়ের চাহিদা ও কাটতি বেড়ে যাবে।

নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম-শিল্প বোর্ড উপরিউক্ত প্রধান প্রধান গ্রামশিল্পের সঙ্গে তেলের ঘানি, গুড়, মধু ও মোম উৎপাদন, তালগুড়, কাগজ, সাবান ও মাটির বাসন প্রভৃতি শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এই সকল শিল্পের প্রচলিত যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধনের কথা বলা হয়েছে।

খাদি (তুলা ও পশম) শিল্পের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনায় যে ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তার মধ্যে অম্বর চরকা প্রবর্তনের জন্য কোন টাকা পৃথকভাবে দেখানো হয় নাই। অম্বর চরকার কার্যকারিতা নিয়ে এখনও পরীক্ষা চলছে। অম্বর চরকা পরীক্ষার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬

খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছেন। এই কমিটির সভ্যগণ প্রচলিত চরকাগুলির মধ্যে অম্বর চরকাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের মতে অম্বর চরকাকে আরও ভাল করে তৈরি করা যেতে পারে, যাতে অম্বর চরকায় উৎপন্ন সূতার পরিমাণ আরও বাড়ে এবং আরও উৎকৃষ্ট সূতা এতে প্রস্তুত হয়। তদন্ত কমিটি মনে করেন যে, অম্বর চরকায় ২৪ কাউণ্ট (counts) পর্যন্ত সূতা ভালভাবে তৈরি হতে পারে। কমিটির সভ্যগণের অধিকাংশের মতে অম্বর চরকার সূতা মোটামুটি শক্ত এবং তাঁতে বয়নের উপযোগী। কিন্তু কমিটির কোন কোন সভ্য মনে করেন যে, এই সূতা আগাগোড়া সমান মোটা নয় এবং হস্তচালিত তাঁতে বয়নের পক্ষে তেমন শক্ত নয়। হস্তচালিত তাঁতে মিলের সূতায় বয়নকার্য যত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা যায় অম্বর চরকার সূতায় তা যাবে না।

মোটের উপর, তদন্ত কমিটি আশা করেন যে, অম্বর চরকা নিয়ে আরও কিছুকাল পরীক্ষা ও গবেষণার পর একে আর একটু উন্নত ধরনে তৈরি করতে পারলে অম্বর চরকা খাদি শিল্পে যুগান্তর আনবে এবং গ্রামাঞ্চলে অম্বর চরকার দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

অম্বর চরকার বিশেষত্ব এই যে, সাধারণ চরকায় যেখানে একটি মাত্র টাকুর সাহায্যে একগাছি সূতা তৈরি হয়, অম্বর চরকায় সেখানে ৫।৬টি টাকুতে একসঙ্গে ৫।৬ গাছি সূতা

প্রস্তুত করা যায় এবং কাজও সাধারণ চরকার তুলনায় তাড়াতাড়ি হয়। কাজেই অম্বর চরকার সাহায্যে খাদি উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং দেশের বস্ত্র সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হবে।

কুটির-শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা ও সহযোগিতার কথা এখানে মোটামুটি আলোচনা করা গেল। সমাজ উন্নয়ন ব্লকে (Community Development Block) বা জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কেন্দ্রে (National Extension Service Block) কুটির শিল্পের বিস্তার ও উন্নয়নের জন্য যেভাবে কাজ হবে তারও মোটামুটি পরিচয় আমরা পেয়েছি। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সকল কুটির শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি :—

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের তালিকা

(ক) খাদ্য ও তাহার সংশ্লিষ্ট শিল্প :—

১। লাঙল, কুঠার, কাস্তে প্রভৃতি কৃষি-যন্ত্রপাতি তৈরি
২। কেক, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদির কারখানা
৩। মৌমাছি পালন—মধু ও মোম উৎপাদন
৪। পক্ষী পালন

৫। কয়লা, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি

৬। মিষ্ট দ্রব্য (Confectionery—Sweets)

৭। ফুল, ফল ও শাক-সবজী উৎপাদন

৮। দুগ্ধ কেন্দ্র—মাখন, ঘি, পনীর প্রভৃতি দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি

৯। শুকনো করে রাখা ফল ও সবজী

১০। হাস ও মুর্গী পালন

১১। মৎস্য চাষ—মাছের তেল, কৌটায় রাখা মাছ, শুটকী মাছ

১২। আটা ও ময়দা তৈরি

১৩। কৌটায় ফল সংরক্ষণ

১৪। আখের গুড়, তালগুড়, খেজুর গুড়, হাতে তৈরি চিনি ও মিছরি

১৫। ফলের মোরব্বা, চিনি ও ফলের রসে তৈরি সংরক্ষিত খাদ্য (Jams, Jellies and preserves)

১৬। গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও শূকর ছানা প্রভৃতি পশু পালন

১৭। যব থেকে তৈরি খাদ্য

১৮। সার উৎপাদন—তেলের খইলের সার, হাড়ের সার, মিশ্র (Compost) সার, ইত্যাদি

১৯। মাংস বিক্রয়

২০। আচার, চাটনি ও মশলাদি তৈরি

২১। বীজ ও চারা উৎপাদন (Nursery)

২২। তেলের ঘানি

২৩। ঢেঁকিতে ধান ভানাই

২৪। আটা, ময়দা ও চালের কল

২৫। লবণ তৈরি

২৬। সিরাপ, সোডা-লেমনেড (aerated water) ও বরফ তৈরি

২৭। গোল আলু অথবা শাঁক আলু থেকে তৈরি গ্লুকোজ

(খ) পরিচ্ছদ ও তাহার সংশ্লিষ্ট শিল্প :—

১। ধুতি, শাড়ি, জামা, প্যাণ্ট প্রভৃতি তৈরি

২। কাচের ও গালার চুড়ি, বালা প্রভৃতি তৈরি

৩। কাপড়ের তৈরি কৃত্রিম ফুল

৪। বিছানা, ঝালর, গদি প্রভৃতি তৈরি

৫। কম্বল তৈরি

৬। কাপড় ছাপার কাজ ও ঐ জন্য 'ব্লক' তৈরি

৭। ব্রাশ তৈরি

৮। টিন, পিতল, হাড়, ঝিনুক প্রভৃতি থেকে বোতাম তৈরি

৯। ক্যালিকো ছাপা

১০। ক্যানভাসের জুতা

১১। কার্পেট বয়ন

১২। তুলা পেঁজা

১৩। সূচী শিল্প—এমব্রয়ডারি কাজ

১৪। পাট ও শণের বস্তা ও দড়ি তৈরি

১৫। শোলা ও কাপড়ের টুপি

১৬। হোসিয়ারী শিল্প—মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি

১৭। জুতার ফিতা ও অন্যান্য ফিতা

১৮। বস্ত্র ধৌতাগার

১৯। চর্ম শিল্প—বুট, জুতা, চপ্পল, চটি, সুটকেস, বিছানা বাঁধার পেটি ইত্যাদি

২০। চামড়া তৈরি (Leather tanning)

২১। লিনেন দ্রব্য

২২। অলঙ্কার শিল্প

২৩। পাট ও শণের চট, গালিচা ও আসন প্রভৃতি তৈরি

২৪। রেশম চাষ, রেশম সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন

২৫। খাদি শিল্প

২৬। দর্জির কাজ

২৭। ছাতা ও ছাতার বাঁট তৈরি

২৮। তুলা, পশম, তসর, পাট প্রভৃতির বয়ন শিল্প—হস্তচালিত অথবা বিদ্যুৎচালিত তাঁতে

২৯। পশমী সূতা ও পশমী দ্রব্য তৈরি

৩০। পশম উৎপাদন

৩১। জরির কাজ

(গ) গৃহনির্মাণ ও তাহার সংশ্লিষ্ট শিল্প :—

১। নানাবিধ বাঁশের কাজ (বাগান ও আসবাবপত্র তৈরি সহ)

২। পিতল-কাঁসার শিল্প

৩। ইট ও টালি তৈরি

৪। বেতের কাজ

৫। মোমবাতি

৬। ছুতোরের কাজ

৭। তক্ষণশিল্প (Carving)—গজদন্ত, প্রস্তর ও কাঠ প্রভৃতির উপর খোদাই কাজ

৮। সিমেণ্টের জিনিস তৈরি—যথা, জানালা, 'ভেন্টিলেটর', বেঞ্চ, নর্দামার 'পাইপ', খেলনা প্রভৃতি

৯। কাঁচ ও চীনামাটির জিনিস তৈরি

১০। তন্তুশিল্প—দড়ি, পাপোশ, আসন, পাটি, মাতুর প্রভৃতি

১১। কাঠের আসবাবপত্র—তক্তপোশ, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, আলনা, রেলের পাটি ইত্যাদি

১২। লোহার বল্টু, পেরেক, তার, জাল, কড়াই, হাতা, দরজার কবজা, খিল ইত্যাদি

১৩। চুন উৎপাদন

১৪। তালা তৈরি

১৫। পিতল, কাঁসা, এলুমিনিয়াম, তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতুর বাসনপত্র

১৬। ছবির ফ্রেম তৈরি

১৭। মাটির বাসন ও খেলনা

১৮। রঙ তৈরি

১৯। কামারশালা

২০। পাথরের কাজ

২১। কাঠের কাজ

২২। টিনের পাতের কাজ

২৩। লোহার পাত থেকে বাক্স, আলমারি, বালতি ও অন্যান্য বাসন তৈরি

২৪। যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ

২৫। কাঠ চেরাই

২৬। নৌকা নির্মাণ

(ঘ) রাসায়নিক শিল্প ঃ—

১। ভেষজ উদ্ভিদ থেকে ঔষধ সংগ্রহ

২। কালি তৈরি

৩। সোডিয়াম কার্বনেট

৪। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড

৫। ফিটকিরি, তুঁতে, হীরাকস প্রভৃতি উৎপাদন

(ঙ) বিবিধ শিল্প ঃ—

১। আগরবাতি তৈরি

২। খেলাধূলার জিনিস

৩। বিড়ি শিল্প

৪। সাইকেলের অংশবিশেষ তৈরি

৫। রঙের কাজের জন্য ব্রাশ

৬। মৃত পশুদেহের সদ্ব্যবহার

৭। কার্ডবোর্ডের বাক্স

৮। চুরুট ও সিগারেট তৈরি

৯। শঙ্খ শিল্প

১০। ক্রেয়ন (Crayons) তৈরি

১১। ছুরি, কাঁচি, কাঁটা, চামচ তৈরি

১২। ভেষজ শিল্প

১৩। রড উৎপাদন

১৪। এনামেলের কাজ

১৫। ধাতুর উপর ‘এনগ্রেভ’ করার কাজ

১৬। বাজী তৈরি

১৭। তাঁত ও তাঁতের সরঞ্জাম তৈরি

১৮। কাঁচ শিল্প

১৯। গঁদ, শিরীষ, রজন, ধূনা উৎপাদন

২০। সোনা ও রূপার কাজ

২১। হাতে তৈরি কাগজ ও কাগজের মণ্ড

২২। ছড়ি, লাঠি ইত্যাদি তৈরি

২৩। মূর্তি শিল্প

২৪। কালি ও কালির প্যাড

২৫। গালা, বার্নিশ ও রঙের কাজ

২৬। টিনের পাত্র

২৭। দেশলাই তৈরি

২৮। মণিকারের কাজ

২৯। নানাবিধ মাতুর ও পর্দা তৈরি

৩০। মার্বেল পাথরের কাজ

৩১। অভ্র শিল্প

৩২। মোটর গাড়ির কাঠামো (Body) তৈরি

৩৩। বাদ্যযন্ত্র তৈরি

৩৪। মুক্তা সংগ্রহ

৩৫। শ্লেট ও পেনসিল তৈরি

৩৬। গন্ধতৈল ও আতর

৩৭। বই বাঁধার কাজ

৩৮। গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামতের কাজ

৩৯। রবারের জিনিস ও খেলনা

৪০। জুতা ও জুতার পালিশ

৪১। সাবান তৈরি

৪২। অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রপাতি

৪৩। তামাক শিল্প—নস্য, জর্দা প্রভৃতি তৈরি

৪৪। ইস্পাতের তৈরি ইঁদুরের খাঁচা, পাখির খাঁচা, পিন, সেফটিপিন, ক্লিপ ইত্যাদি

৪৫। সেলাই কল

৪৬। বৈদ্যুতিক বাতি ও অন্যান্য দ্রব্য

পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচনাকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকল্পনা কমিশনের নিকট. পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২৬৬ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। পরিকল্পনা কমিশনের সহিত আলোচনা ক্রমে এই টাকার পরিমাণ কমিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৬১'৫ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। পরে সমস্ত রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাগুলি একত্র করে পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণকে শতকরা ৫ টাকা হারে কমিয়ে দেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে ও পরিচালনায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে কাজগুলি পশ্চিমবঙ্গে হবে তার জন্য মোট বরাদ্দ টাকার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ১৫৩ কোটি ৪৪ লক্ষে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েত, বন্যা নিরোধ, শহর এলাকায় জল সরবরাহ, গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ এবং গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় হবে তা অবশ্য পূর্বোক্ত ১৫৩'৪৪ কোটি টাকার মধ্যে ধরা হয় নাই, কারণ এই কাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা ভারত সরকার করবেন স্থির হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই পরিকল্পনায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক কাজে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার একটা মোটামুটি হিসাব নিচে দেওয়া গেল—

	কোটি টাকা
১। **কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন**	৩৩·৩৬
কৃষি উৎপাদন	৪·৪৮
জল নিকাশ ব্যবস্থা (Minor Irrigation)	২·৮৫
জমি উন্নয়ন (Land Development)	০·৩০
শস্যাগার ও বিক্রয় ব্যবস্থা (Warehousing & Marketing)	০·৯৭
পশুপালন	১·৭১
দুগ্ধ কেন্দ্র ও দুগ্ধ সরবরাহ	৪·৬৭
বন	১·৯০
মৎস্যচাষ	০·৭৪
সমাজউন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা পরিকল্পনা	১৪·২৫
সমবায়	১·৩৩
বিবিধ	০·১৬
২। **সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি**	৩০·৪০
Multipurpose Project	১৪·১৮
বড় এবং মাঝারি ধরনের সেচ পরিকল্পনা	৩·৮৭
বিদ্যুৎ	১২·৩৫

৩।	**শিল্প ও খনি**	**৯.৪৮**
	কারখানায় উৎপাদন (Factory Production)	১.৯০
	শিল্প উপনিবেশ ও শহর নির্মাণ	.৫৪
	গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	৭.০৪
৪।	**যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা**	**১৯.০৩**
	রাস্তা	১৭.১০
	যানবাহন	১.৯৩
৫।	**শিক্ষা**	২১.৩০
৬।	**স্বাস্থ্য**	১৯.৯৫
৭।	গৃহনির্মাণ	৮.৫৯
৮।	**অন্যান্য সমাজ-সেবামূলক কার্য**	৩.০২
	শ্রম	১.৩১
	অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণ	১.৬৬
	সমাজ কল্যাণ	০.০৫
৯।	বিবিধ	২.১৪
*১০।	পশ্চিমবঙ্গ ডেভোলাপমেণ্ট কর্পোরেশন	৬.১৭
		১৫৩.৪৪

* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার নিম্নলিখিত কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ডেভোলাপমেণ্ট কর্পোরেশন গঠন করছেন—

(১) কলিকাতার পূর্বদিকে অবস্থিত দুটি বৃহৎ জলাভূমির উদ্ধার

(২) কলিকাতার নর্দমাগুলির ময়লা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং ঐ ময়লা জল থেকে গ্যাস ও সার উৎপাদন

(৩) দুর্গাপুরে কোক-গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা (Durgapur Coke-Oven Plant cum Power Project.)

এই কাজগুলি শেষ করতে ডেভালাপমেণ্ট কর্পোরেশনের মোট প্রয়োজন হবে ২৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা—এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত অর্থ হচ্ছে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

উপরের তালিকাটিতে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনায় শিল্প খাতে ধরা হয়েছে ৯·৪৮ কোটি টাকা, এবং এই টাকার মধ্যে বৃহৎ কারখানা শিল্পে ব্যয় হবে মাত্র ১·৯ কোটি টাকা।

অবশিষ্ট টাকার প্রায় সমস্তই গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নে ব্যয় হবে। দেশের বৃহৎ শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাধীনে রাখা হয়েছে। ভারত সরকার সরাসরি ভাবে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর যতটা সম্ভব জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অবস্থা ও কার্যকরী ক্ষমতা পরিমাপের জন্য একটি তদন্ত হয়। প্রত্যেক জেলা

হিসাবে এই তদন্তের বিবরণ ছাপা হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মাবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার প্রচার অফিস থেকে এই শিল্প তদন্তের বিবরণের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী. পরিকল্পনায় কুটিরশিল্প খাতে খরচ হয়েছে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা। এই টাকায় হস্তচালিত তাঁত, খাদি, শাঁখা, হাতে তৈরি কাগজ, গুড়, মাদুর, দড়ি, পাপোশ, কার্পেট, শতরঞ্চ, চীনামাটি ও পিতল-কাঁসার বাসন, নানাবিধ খেলার জিনিস, মধু ও মোম উৎপাদন প্রভৃতি প্রচলিত কুটির শিল্পগুলির উন্নতি বিধান করা হয়েছে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে খাদি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হবার পর ১১৭০টি গ্রামের ৩১৮৪২ জন গ্রামবাসীকে খাদিশিল্পে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই সকল খাদি কেন্দ্রে ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার গজ খাদি বস্ত্র এবং ৩৪৫১ মণ খাদি সূতা তৈরি হয়েছে।

উন্নততর প্রণালীতে হস্তচালিত তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ফুলিয়া এবং নবদ্বীপে শিল্প কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র বয়নকারীদের বহু সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের প্রয়োজনীয় সূতা সরবরাহ ও উৎপন্ন বস্ত্রের বিক্রয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছে। এরূপ ৬৩টি তাঁতবস্ত্র উৎপাদন সমিতিকে একত্র করে একটি কেন্দ্রীয় তাঁত শিল্পী সমবায় সমিতি গঠন

করা হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির পরিচালনায় ১০০টি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তাঁতিরা শাড়ি-কাপড় তৈরি করতে যাতে সস্তায় তাদের সূতা রঙ করে নিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কুড়িটি সূতা রঙ করার কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তাঁত শিল্পী সমবায় সমিতি তার অধীন সমস্ত তাঁত বস্ত্র উৎপাদন সমিতির তৈরি কাপড়গুলি সমিতির বিক্রয়-কেন্দ্রগুলিতে জমা নেয়। এই সমস্ত কাপড় বিক্রি শেষ হবার আগেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সমিতির মারফতে তাঁতিদের মজুরির টাকা অগ্রিম দেবার ব্যবস্থা করেন। সরকার বস্ত্র উৎপাদন সমিতির তাঁতিদের প্রয়োজনীয় সূতাও ধারে সরবরাহ করেন।

শঙ্খশিল্পীদের শাঁখা তৈরির ব্যবসায়ে সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাজ সরকারের নিকট থেকে সরকারী দপ্তরের মারফত শঙ্খ খরিদের বন্দোবস্ত করেছেন। সিংহল থেকেও ৩ লক্ষ টাকার শঙ্খ খরিদের ব্যবস্থা হয়েছে। নদীয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের শঙ্খশিল্পী সমবায় সমিতিগুলির প্রত্যেকটিকে ৫০০০৲ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

হাতে তৈরি কাগজশিল্পটিকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। কলিকাতায় আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ হাতে তৈরি কাগজের একটি উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ছেঁড়া কাপড়ের মণ্ড থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ এই কেন্দ্রে তৈরি হয়। অফিসের ‘ফাইল কভার’, এনভেলাপ, ‘ফাইল-ক্লাপ’ প্রভৃতিও এখানে প্রস্তুত হয়।

গুড় উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গের একটি অতি পুরাতন কুটির-শিল্প। এই শিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে ১১৮টি গুড় উৎপাদন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছেন।

১১৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ও বেসরকারী গুড় উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে মোট ১৯৪০৫ মণ গুড় উৎপন্ন হয়েছে। তালগুড় শিল্পকে ব্যাপকভাবে প্রচলনের জন্য সরকার বহু অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। কর্মচারীরা বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে গিয়ে গ্রামবাসীদের আধুনিক পদ্ধতিতে তালগাছ কেটে রস সংগ্রহের কৌশল এবং উন্নততর প্রণালীতে চুল্লী তৈরী করে ঐ রস থেকে অল্প সময়ে গুড় তৈরি করা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পল্লীতে পল্লীতে তালগুড় শিল্পীদের সমবায় সমিতি গঠন করে সরকার এই সব কাজ করছেন। রস জ্বাল দেবার জন্য সমিতির কর্মীদের সরকার থেকে নূতন ধরনের কড়াই ও গাছ কাটার জন্য কাটারি প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াও সরকার তালগুড় শিল্পীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেন। উৎপন্ন তালগুড় বিক্রির ব্যবস্থাও সরকার থেকে করা হয়।

নানাবিধ খেলার জিনিস তৈরি শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতার নিকটে একটি উৎপাদনও শিক্ষা কেন্দ্র (Training cum Production Centre) স্থাপিত হয়েছে। পিতল-কাঁসার বাসন শিল্পের প্রসারের জন্য ভারত সরকারের সহায়তায় একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং

বাঁকুড়াতে এই শিল্পের একটি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। মেদিনীপুর জেলার বৈসনা চকে পশুর শিং থেকে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য তৈরি শিক্ষা দেবার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২৫ জন শিক্ষার্থী এখানে এই শিল্পে শিক্ষালাভ করছে। কেরালা রাজ্যে এই শিল্পের প্রচলন খুব বেশী এবং ভারতের বাইরে বিদেশের বাজারে এই শিল্পদ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

বঙ্গবিভাগের পর মেদিনীপুর এবং বসিরহাটে মাছুর শিল্প বিস্তার লাভ করেছে। মাছুর শিল্পের উন্নয়নের জন্য মাছুর-বয়নকারীদের নিয়ে ১৭টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই সকল সমিতির মোট সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ৮১৫। মাছুর বয়ন শিল্পী সমিতিগুলির কাজে সাহায্যের জন্য পশ্চিম-বঙ্গ সরকার একটি মাছুর শিল্প গবেষণা কেন্দ্র খুলেছেন। কাঁচা মাল সংগ্রহে সাহায্যের জন্য মেদিনীপুরের পাঁচটি মাছুর শিল্প সমবায় সমিতিকে সরকার থেকে ২০ কুড়ি হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ হাজার মাছুর তৈরির কারিকর আছে। পূর্ববঙ্গ থেকে বহু হিন্দু কারিগর এসে মেদিনীপুর, ২৪পরগনা, হাওড়া ও বর্ধমানে বনবাস করছে। বর্তমানে মেদিনীপুরেই মাছুর শিল্পীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ মাছুর মেদিনীপুরেই তৈরি হয়।

এক রকমের লম্বা ঘাস থেকে মাছুর তৈরি হয়। সাধারণত এই ঘাসকে বলা হয় মাছুর কাঠি বা মাছুর ঘাস। মেদিনীপুর,

২৪পরগনা ও বর্ধমানে এই ঘাসের প্রচুর চাষ হয়। মেদিনীপুরের মাদুর কাঠি উৎকৃষ্ট। ২৪পরগনা জেলার অনেক জলা জায়গায় ‘মিলে’ ঘাস নামে এক রকম ঘাস আপনা থেকেই জন্মে। এগুলি দেখতে অনেকটা মাদুর কাঠির মত, তাই মিলে ঘাসও মাদুর তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

মোতরা গাছের ছাল থেকে পাটি তৈরি হয়। মোতরা গাছগুলি আট-নয় ফুট লম্বা হয় এবং আধ থেকে দেড় ইঞ্চি ব্যাস পর্যন্ত মোটা হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের খাল, বিল ও ডোবা অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় মোতরা গাছ আপনা হতেই জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে আগে ‘মোতরার’ চাষ ছিল না, তাই এখানে পাটি তৈরির কারিকরও ছিল না। বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু কারিকর পশ্চিমবঙ্গে এসে ‘মোতরার’ চাষ আরম্ভ করেছে।

কুটির শিল্প হিসাবে মাদুর ও পাটি তৈরির কাজ একটি লাভজনক বৃত্তি। বাড়ির মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ করেও সপ্তাহে ৩।৪টা মাদুর তৈরি করতে পারে। ১৫।২০৲ টাকা খরচ করলেই মাদুর তৈরির যন্ত্রপাতি যোগাড় করা যায়। মাদুরের চাহিদাও বাজারে যথেষ্ট। শীতল পাটিরও সমাদর গৃহস্থের ঘরে ঘরে। বর্মা, সিংহল, সৌদী আরব ও ইরাক প্রভৃতি বিদেশের বাজারেও পশ্চিম বাংলার মাদুর রপ্তানি হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এজন্য মাদুর ও পাটি তৈরির কারিগরদের সমবায় সমিতির মারফতে সঙ্ঘবদ্ধ করে এই শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নের চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে শিল্পশিক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপর। গুড় শিল্পের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে প্রায় দুই লক্ষ মণ গুড় তৈরি হবে। প্রায় ৩০০ টন হাতে তৈরি কাগজ উৎপন্ন হবে। কুটির শিল্পে দেশলাই উৎপাদনের কাজে ৪০০ লোক জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাবে। উন্নত ধরনের হস্ত-চালিত তাঁতের কাজ শিক্ষাদানের জন্য ২৫০টি হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হবে। অন্যান্য কুটির শিল্পেরও অনেক-গুলি শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্র (Training-Cum-Production Centre) খোলা হবে। ২৪ পরগনা জেলায় হাবরা উদ্বাস্তু উপনিবেশে ৬০ জন শিক্ষার্থীকে ডুরি বয়ন শিল্প শেখাবার জন্য একটি শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এই সকল শিক্ষার্থীদের পরে সরকারী উৎপাদন কেন্দ্রে বেতনভোগী কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা হবে। এই শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৫২,৮২৩ টাকা মঞ্জুর করেছেন। বিভিন্ন হাতের কাজ শিক্ষা দেবার জন্য নিখিল ভারত হস্ত শিল্প (Handicrafts) বোর্ড পশ্চিমবঙ্গে হাতের কাজের (Handicrafts) তিনটি Training Cum Production Centre খুলছেন। ফিতা তৈরির দুটি নূতন কারখানা পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হচ্ছে। এই কারখানা দুটিও শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনায় রেশম শিল্পের উন্নয়ন ব্যবস্থাকে

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক কালে রেশম শিল্পের জন্য এই প্রদেশ বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন যুগ থেকে বাংলা ও আসামে উৎপন্ন রেশম বস্ত্র ভারতের বাইরে নানা স্থানে রপ্তানি হয়ে আসছিল। বাংলা ও আসামের পরে কাশ্মীরে এই শিল্পের প্রবর্তন হয়। কাশ্মীর থেকে রেশম শিল্প ক্রমে কোল্লেগল ও মহীশূরে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজেরা ভারতে রাজ্য স্থাপনের পর রেশম ব্যবসার উন্নতির জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করে। তাতে বিশেষ ফল না পেয়ে ইংরেজ সরকার ভারতে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চীন থেকে রেশম পোকা ও তুঁত গাছ আমদানি করেন। বাংলাদেশের পক্ষে এর ফল হল বিপরীত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে রেশম পোকার মড়ক লেগে গেল; ফলে বাংলার উন্নতিশীল রেশম শিল্প নষ্ট হল। সৌভাগ্যক্রমে রেশম পোকার এই ব্যাপক ব্যাধি কাশ্মীর ও মহীশূরে দেখা দেয়নি। তাই সেখানকার রেশম শিল্প এই ক্ষতির থেকে বেঁচে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্যারাশুট তৈরির জন্য রেশম বস্ত্রের চাহিদা দারুণ বেড়ে যায়, ফলে ভারতেও রেশম চাষ ও শিল্পের অনেকখানি উন্নতি ঘটে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪৪৬১৩ একর জমিতে তুঁত গাছের চাষ হত; ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে প্রায় দেড় লক্ষ একর জমিতে তুঁত গাছের চাষ হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে রেশম চাষ এখনও অনেকখানি পিছিয়ে আছে। ভারতের বাৎসরিক প্রয়োজন এক কোটি পাউণ্ড রেশম ও রেশম

দ্রব্য, সেখানে উৎপন্ন হয় মাত্র ২১ লক্ষ পাউণ্ড। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০০০ একর নূতন জমিতে তুঁত গাছ চাষের সিদ্ধান্ত করেছেন। উন্নত ধরনের রেশম বীজ (Seeds of cocoons) ও তুঁত গাছ উৎপন্ন করা হবে। রেশম শিল্পীদের সূতা তৈরির কাজে চরকা সরবরাহ করা হবে। রেশম উৎপাদনের হার যাতে বাড়ে এবং উন্নততর রেশম সূতা ও বস্ত্র উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে।

ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনার কথা আগেই বলা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ফলে পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনের পথ সহজ হয়েছে। কল্যাণীতে একটি শিল্প উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। বৃহৎ শিল্পের সহযোগী (ancillary) শিল্প হিসাবে সাইকেলের অংশ (parts) তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার ব্যবস্থা করছেন।

সরকার পরিচালিত শিক্ষা-সহ-উৎপাদন কেন্দ্রগুলি (training cum production centre) ছাড়াও বেসরকারী শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে পশ্চিম বঙ্গের শিল্প অধিকার (Directorate of Industries) থেকে প্রতি মাসের হিসাবে অর্থ সাহায্য করা হয়। বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান বা সমিতি হস্তচালিত তাঁতের কাজ শেখাবার জন্য বয়ন বিদ্যালয় অথবা হাতের কাজের (Handicrafts) বা তন্তুশিল্পের (Coir Industry) বিদ্যালয় গড়ে তুললে

শিল্প অধিকারের কর্মচারীরা এইগুলি পরিদর্শন করেন এবং এই শিল্প বিদ্যালয়গুলির কাজ সন্তোষজনক হলে, এগুলি পরিচালনার জন্য শিল্প অধিকার মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এই সকল শিল্প বিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যাপারেও শিল্প অধিকার অর্থ মঞ্জুর করেন। শিল্প অধিকারে আবেদন করলে সরকারের 'শিল্প প্রতিপাদক দল' (Cottage Industry Demonstration Party) গ্রামাঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় লোকদের বিভিন্ন শিল্প কাজে শিক্ষা দিয়ে আসেন।

সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনাতেও জীবিকা অর্জনের জন্য উদ্বাস্তুদের কুটির-শিল্পে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। পুনর্বাসন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত উদ্বাস্তুদের শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে তন্তুশিল্প (coir weaving & spinning), ছাটাই রেশম থেকে সূতা তৈরির কাজ (waste silk spinning), দর্জির কাজ, ব্লক ছাপার কাজ (block printing) ও ছাতা তৈরি প্রভৃতি শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। পুনর্বাসন বিভাগ কয়েকটি আবাসিক (residential) শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছেন। এগুলির সমস্ত ব্যয় পুনর্বাসন বিভাগ বহন করেন এবং এখানে উদ্বাস্তু শিক্ষার্থীদের খাওয়া-পরার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়। নির্ভরযোগ্য বেসরকারী সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের মারফতেও পুনর্বাসন বিভাগ কতকগুলি শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেন। এগুলিতে উদ্বাস্তু শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে এসে কাজ শিখে যায় এবং এর জন্য তারা প্রত্যেকে মাসিক ১৫ টাকা

হিসাবে ভাতা পায়। এ ধরনের প্রত্যেকটি শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য পুনর্বাসন বিভাগ নিম্নলিখিত হারে ব্যয় মঞ্জুর করেন ঃ—

প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ভাতা	—	১৫ টাকা
প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য কাঁচা মাল	—	৭ টাকা
” ” নৈমিত্তিক খরচ	—	১ টাকা
প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ঘরভাড়া		২ টাকা
” ” শিক্ষক বেতন	—	৫ টাকা
প্রতিমাসে প্রতি শিক্ষার্থীর মাথা পিছু মোট ব্যয়		৩০ টাকা

অর্থাৎ, একটি শিক্ষা কেন্দ্রে যদি ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকে, তাহলে সেই কেন্দ্রের চলতি ব্যয়ের জন্য পুনর্বাসন বিভাগ থেকে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়া কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য পুনর্বাসন বিভাগ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে পারেন।

গ্রামশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের কাঁচা মাল ও মূলধন সরবরাহের জন্য সরকারী ব্যবস্থা পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলিকে কার্যকরী মূলধন সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন (State Finance Corporation) গঠিত হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কর্পোরেশন ৬টি ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থাকে মোট সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছেন। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ৯টি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন মোট ২৮৭৭৫০০৲ টাকা ঋণ দিয়েছেন। কিন্তু এই দুই

বৎসরেই স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন ঋণের জন্য অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার আবেদনপত্রগুলি অগ্রাহ্য করেছেন। এইসব আবেদনকারীদের ঋণের জন্য উপযুক্ত জামিন এবং ঋণ পরিশোধ করবার মত সন্তোষজনক অবস্থা না থাকার দরুনই কর্পোরেশন তাদের আবেদন নামঞ্জুর করেছেন। ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি আরও একটু সুগঠিত হলে এবং স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশনের আর্থিক সংগতি আরও বৃদ্ধি পেলে ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যকরী মূলধন সরবরাহের সমস্যা আরও সহজ হবে আশা করা যায়।

গ্রামশিল্পের কার্যকরী মূলধনের জন্য সমবায় ঋণদান সমিতির কথা আগেই বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে এই উদ্দেশ্যে পুনর্গঠিত করা হবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। এর মধ্যে দুইটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তুলে দেওয়া হবে, বাকি ৩৮টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মিলিয়ে মিশিয়ে পুনর্গঠিত করে ২৪টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে পরিণত করা হবে। অর্থাৎ, বর্তমানের ৪০টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থলে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্গঠিত ২৪টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাজ করবে।

বর্তমানে এই প্রদেশের সাত হাজার সমবায় ঋণদান সমিতির মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার সমিতিরই কোন কর্মক্ষমতা নাই। কাজেই, এই সমিতিগুলিকে তুলে দেওয়া হবে। বাকি সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত করে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে।

এদের মধ্যে এক হাজার সমবায় ঋণদান সমিতির প্রত্যেকের শেয়ার-মূলধন বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকা করা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার অংশীদার হিসাবে এই এক হাজার বৃহদাকার সমবায় ঋণদান সমিতির প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা শেয়ার-মূলধন বাবদ দেবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় এক কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে ঋণ নিয়ে সংগ্রহ করবেন।

কোন নূতন জায়গায় নূতন কোন কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে সরকার থেকে অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পেতে পারে, এজন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগ সম্প্রতি এক নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই ব্যবস্থায় ঋণের জন্য এরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জেলা শাসকের নিকট আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর জেলা শাসক যদি মনে করেন যে, আবেদনকারীর প্রস্তাবিত শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক এবং আবেদনকারী ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন, তাহলে তিনি নিজের বিবেচনামত আবেদনকারীকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারেন। যদি জেলা শাসক মনে করেন যে, আবেদনকারীকে ২৫০০ টাকার বেশী ঋণ দেওয়া সঙ্গত, তাহলে তিনি সুপারিশ সহ আবেদনকারীর দরখাস্ত শিল্প-অধিকর্তার (Director of Industries) নিকট পাঠালে, শিল্প অধিকর্তা নিজের বিবেচনায় আবেদনকারীকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারেন।

উপরিউক্ত ঋণ গ্রহণ করতে আবেদনকারীকে উপযুক্ত জামিন দিতে হবে এবং সরকারের নির্দেশমত একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী ঋণের টাকা শোধ করতে না পারলে সরকার সার্টিফিকেট প্রয়োগে টাকা আদায় করতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই ঋণ বাবদে ২৪-পরগনা জেলার জন্য ৭০,০০০ টাকা এবং কলিকাতা ও পুরুলিয়া বাদে বাকী জেলাগুলির প্রত্যেকটির জন্য ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন শিল্পবিস্তার পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক জেলায় একজন 'জেলা শিল্প উন্নয়নাধিকারিক' (District Industrial Development Officer) নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যেক মহকুমায় একজন শিল্প পরিদর্শক (Inspector) থাকবেন। শিল্প বিভাগের এই কর্মচারিগণ জেলার প্রত্যেক অংশে শিল্পবিস্তার ও উন্নয়ন সম্পর্কে দেখাশুনা করবেন, এবং শিল্প-ঋণ সম্পর্কে দরখাস্তগুলি সংগ্রহ করে তাঁদের মন্তব্য সহ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাবেন। সমবায় সমিতিগুলিকে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নের কাজে অর্থসাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পৃথক টাকা মঞ্জুর করেছেন। ১৯৫৭ সালের প্রথম তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এজন্য ৫৪টি সমবায় সমিতিকে ৬,৪০,০০০ টাকা ঋণ দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড (Central Social

welfare Board) নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য কর্মরত সঙ্ঘ বা সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন। এই হিসাবে যে সমস্ত সমিতিতে মেয়েদের কুটির শিল্পে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে, তারা কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ডের কাছে আবেদন করলে তাদের মোট খরচের অর্ধেক পরিমাণ টাকা সাহায্য পেতে পারে। এই সাহায্যের জন্য আগে সরাসরি দিল্লীতে আবেদন করতে হত ; এখন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ডের প্রাদেশিক শাখা-অফিসে আবেদন করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা ও সুযোগসুবিধার কথা মোটামুটি আলোচনা করা গেল। প্রচলিত কুটির শিল্পগুলির অন্যান্য খবর পরবর্তী প্রসঙ্গে সংগ্রহ করা যাবে।

কুটির শিল্পে জাপান

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভারত সরকারের পুনর্বাসন এবং শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর দুইটির দুইজন প্রতিনিধি জাপানের কুটির শিল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করতে যান। তাঁরা দুইমাসকাল জাপানের নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে প্রায় ১০০টি শিল্পকেন্দ্র দেখেন এবং ভারতে ব্যবহারের জন্য জাপান থেকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অনেকগুলি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বন্দোবস্ত করেন। ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে শিক্ষাদানের জন্য তাঁরা জাপানের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কারিগরকেও মনোনীত করেন। জাপানের বিভিন্ন শিল্পে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। জাপানের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আমরা এই বিবরণ থেকে পেয়েছি।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে জাপানের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে। জাপানের সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা ৫৪টি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে একজন মাত্র কারিগর কাজ করে, শতকরা ৪০টি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে দুই থেকে চারজন মাত্র কারিগর কাজ করে। জাপানের সমস্ত কারখানাগুলির হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, এগুলির শতকরা ৯৬টি

কারখানার (Factory) প্রত্যেকটিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ৫ থেকে ১০০ জনের মধ্যে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অন্যান্য দেশের তুলনায় বিদেশের বাজারে সব চেয়ে বেশী বস্ত্র জাপান থেকে রপ্তানি হত। জাপানের ক্ষুদ্র শিল্পে এই বিপুল পরিমাণ বস্ত্র প্রধানত উৎপন্ন হত। বস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত জাপানের ২১০০০০ শ্রমিকের মধ্যে বড় বড় কাপড়ের কলগুলিতে মাত্র ৩০০০০ শ্রমিক কাজ করত, অর্থাৎ উৎপন্ন বস্ত্রের সাত ভাগের ছয় ভাগই তৈরি হত জাপানের ছোট ছোট গৃহ-শিল্পে। এদের অনেকগুলি স্বাধীনভাবে বস্ত্র উৎপাদন করত, আবার কতক-গুলি বড় মিলের সহযোগিতায় কাজ করত। বস্ত্র শিল্পের ন্যায় রবার, ঘড়ি, ক্যামেরা, ফাউণ্টেন পেন, বৈদ্যুতিক বাতি ও অন্যান্য দ্রব্য, সাইকেল, দেশলাই প্রভৃতি নানা রকম প্রয়োজনীয় জিনিস জাপানের ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপন্ন হয়।

গৃহ-শিল্প জাপানের গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। জাপানের গ্রামাঞ্চলে এরূপ ঘরোয়া-কারখানার সংখ্যা ৫০,০০০এর কম হবে না। কৃষকেরাও চাষের অবসর সময়ে এই সব গৃহ-শিল্পে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে জাপানের প্রত্যেকটি গৃহ একটি শিল্পাগার। তিনটি গ্রামে ৩২০০ ঘরোয়া কারখানা আছে। ওগোয়া নামে একটি গ্রামে এক হাজারেরও বেশী বাড়িতে হাতে কাগজ তৈরি হয়।

জাপানের কয়েকটি কুটির শিল্প

ভারত সরকারের প্রতিনিধিদ্বয় তাঁদের বিবরণে জাপানের কতকগুলি কুটির শিল্পের উল্লেখ করেছেন। এখানে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল—

১। বাঁশের শিল্প

(ক) মাছ ধরার ছিপ

জাপানের একটি অঞ্চল থেকে বছরে ৩০ লক্ষ বাঁশের ছিপ আমেরিকায় রপ্তানি হয়। এগুলি তৈরি করা খুবই সহজ। ছিপ তৈরি করবার মত উপযুক্ত বাঁশের খণ্ড বেছে নিয়ে কস্টিক সোডা দ্রবণে ভিজিয়ে পরিষ্কার করে মসৃণ করা হয়, তারপর কয়লার আগুনের উপর গরম করে ছিপটিকে সোজা করা হয়। মাছ ধরবার ছিপ ছাড়া অন্য কাজেও বাঁশের বহু জিনিস আমেরিকায় বহু সংখ্যায় চালান যায়। আমাদের দেশের বহু জায়গায় নানা শ্রেণীর বাঁশবাগান আছে। আমরা অনায়াসে এই শিল্পকে গড়ে তুলতে পারি।

(খ) বাঁশের খাঁচা, ঝুড়ি, মাদুর, খেলনা, সূচ ইত্যাদি

বিদ্যুৎচালিত মেশিনে প্রায় এক ফুট লম্বা ও এক থেকে দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া করে বাঁশের টুকরো কেটে নেওয়া হয়। আর একটি মেশিনে এই টুকরোগুলিকে আরও পাতলা কাঠিতে পরিণত করা হয়। অন্য একটি মেশিনে কাঠিগুলিকে সমানভাবে গোল করা হয়। ইলেকট্রিক ড্রিলের সাহায্যে

কাঠিগুলিতে ছিদ্র করা হয়। তারপর এইগুলি দিয়ে বাঁশের খাঁচা, ট্রে, খেলনা, স্থচ প্রভৃতি নানা রকম জিনিস তৈরি হয়।

(গ) বাঁশের বোতাম ও বকলেস

২।৩ ফুট লম্বা ও এক থেকে দেড় ইঞ্চি চওড়া বাঁশের টুকরো কেটে নেওয়া হয়, তারপর বিদ্যুৎচালিত পাঞ্চিং মেশিনে খুব দ্রুতগতিতে তা থেকে বোতামের মত গোল টুকরো কেটে বের হয়ে আসে। সেগুলিকে আবার মেশিনে ফেলে বোতামের আকার দেওয়া হয় এবং ড্রিলের সাহায্যে বোতামে ছিদ্র করা হয়। এর পর পাইকারী দোকানদারেরা এগুলি কিনে নিয়ে রঙ করবার জন্য গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে আসে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের অবসর সময়ে বাড়িতে বসে বোতামগুলি রঙ করে। বোতাম তৈরির কারখানা থেকে বাঁশের বকলেস, হ্যাণ্ডব্যাগের হাতল, জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্র্যাকেট প্রভৃতিও তৈরি হয়।

বাঁশের বোতাম তৈরির এক সেট মেশিনের দাম প্রায় ৪০০০ টাকা এবং এ থেকে মাসে ১৫০০০ বোতাম তৈরি করা যেতে পারে।

(ঘ) বাঁশের প্লাইউড

জাপানে এটি একটি নূতন শিল্প। মেশিনের সাহায্যে বাঁশ থেকে কাগজের মত পাতলা ও লম্বা পাত বের করে নেওয়া হয়, তারপর এই পাত দিয়ে নানা আসবাবপত্র, ঘরের ছাদ, দরজা ও জানালার কপাট, ট্রে ইত্যাদি সুন্দর করে মোড়া যায়।

(ঙ) বাঁশের পর্দা

খুব ভারী একটা লোহার চাকার মধ্যে নানা আকারের ৮-১০টি গোল ছিদ্র থাকে, অর্থাৎ, যাতে নানা আকারের মোটা বাঁশ এই ছিদ্রপথে প্রবেশ করতে পারে। এই ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে আবার ৮-১০খানা ধারালো চাকু বসানো আছে। বাঁশের এক মাথা এই ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য মাথা থেকে ভারী লোহার সাহায্যে চাপ দিলে বাঁশটি ৮-১০ খণ্ডে চেরাই হয়ে বেরিয়ে আসে। এই খণ্ডগুলিকে আবার বিদ্যুৎচালিত মেশিনে ফেলে বাঁশের পাতলা পাতে পরিণত করা হয়। তারপর পায়ে-চালানো তাঁতের সাহায্যে এগুলি একত্র বয়ন করে বাঁশের পর্দা তৈরি হয়। ওসাকার নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে বছরে প্রায় ২৪০০০০ টাকার বাঁশের পর্দা আমেরিকায় চালান যায়। এই গ্রামের ২০টি কারখানায় ১৫০ খানা পর্দা তৈরির তাঁত আছে। সব চেয়ে বড় আকারের (১০ ফুট চওড়া) তাঁতের দাম প্রায় ১০০০ টাকা এবং অন্যান্য যন্ত্রের দাম প্রায় ৫০০ টাকা। একজন মহিলা কর্মী দৈনিক প্রায় ২০খানা বাঁশের পর্দা তাঁতে বয়ন করতে পারেন (পর্দার আকার ৬′ × ৫′-৫″)

জাপানীরা বাঁশ থেকে প্রায় ১৪০০ রকমের জিনিস তৈরি করে এবং এর অনেক জিনিস আমেরিকায় চালান দিয়ে ডলার উপার্জন করে।

২। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো থেকে নূতন কাপড় তৈরি

যুদ্ধের সময় জাপানে তুলা ও পশমের অভাব হওয়ায় জাপানীরা এই শিল্প প্রবর্তন করে। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো থেকে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের (Scutching machine) সাহায্যে তুলা বের করে নেওয়া হয়, তারপর এই তুলাকে আবার যন্ত্রে (Carding machine) ফেলে সূতা তৈরির উপযুক্ত করা হয়। ১০ থেকে ১২ নম্বরের (Counts) সূতা এই তুলা থেকে তৈরি হয়। ঘরের পর্দা, সতরঞ্চ, ব্যাগ প্রভৃতি নানারকম জিনিস এই সূতায় প্রস্তুত হতে পারে। ছেঁড়া টুকরো থেকে দৈনিক ৪০০ পাউণ্ড তুলা তৈরি হবার মত যন্ত্রপাতির দাম প্রায় ১৫০০০ টাকা।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার একটি কাপড়ের কল তুলা, পশম ও রেশম বস্ত্রের ছেঁড়া টুকরো অথবা ছাঁটাই অংশ (waste) থেকে সূতা তৈরি করার যন্ত্রপাতি জাপান থেকে খরিদ করেছেন।

৩। চুলের কাঁটা

ওসাকা শহরের একটি সরু গলির মধ্যে ছোট ছোট তিনটি ঘর নিয়ে দুইটি কারখানায় প্রতিমাসে ২৫ লক্ষ চুলের কাঁটা তৈরি হচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ মিলে দুটি কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ১৮জন।

বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রে লোহার পাতলা তার চুলের কাঁটা তৈরির জন্য টুকরো করে কাটা হচ্ছে। এই টুকরোগুলি

ছোট মেয়েরা হাত মেশিনের মধ্যে ফেলে চুলের কাঁটার সরল অথবা ঢেউ তোলা আকার দিচ্ছে। কখনো বা অটোমেটিক মেশিনে লোহার তার কাটা এবং কাঁটার আকারে ঢেউ তোলা এবং বাঁকানো, সবই এক সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে। এরপর কালো এনামেল আর কেরোসিনের দ্রবণে মিশিয়ে কাঁটাগুলিকে বাজারে বিক্রির উপযোগী করা হয়।

তিন রকমের চুলের কাঁটা তৈরি করবার মত যন্ত্রপাতি ও ছাঁচের (dies) মোট মূল্য হবে প্রায় ১২০০০ টাকা।

৪। সেলুলয়েড শিল্প

ওসাকার নিকটবর্তী একটি গ্রামে বহু সংখ্যক ঘরোয়া কারখানাতে সেলুলয়েডের চিরুনি, খেলনা, ফুল, পাত্র, টুথব্রাশ ইত্যাদি তৈরি হয়। গ্রামটিকে এজন্য বলা হয় 'সেলুলয়েড গ্রাম।'

(ক) সেলুলয়েডের চিরুনি—বৈদ্যুতিক কাটুনি যন্ত্রে (Electric Cutter) সেলুলয়েডের পাতকে চিরুনির টুকরো করে কেটে নেওয়া হয়। টুকরোগুলিকে তারপর ছাঁচের মধ্যে ফেলা হয় এবং জলের চৌবাচ্চার মধ্যে ৫ থেকে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে গরম করা হয়। এক সেট বৈদ্যুতিক করাতের সাহায্যে প্রতি টুকরোতে চিরুনির দাঁত কাটা হয়। তারপর মেয়ে কর্মীরা হাত-রেতি দিয়ে দাঁতগুলি ঘষে চিকন এবং পালিশ করে। চিরুনি তৈরির যে কারখানাটি ভারতীয় প্রতিনিধিদ্বয় দেখেছিলেন, সেখানে মাত্র ১০জন শ্রমিক কাজ

করে। প্রতিমাসে এই কারখানায় প্রায় ৫০০০ ডজন চিরুনি তৈরি হয়। প্রথমে মাত্র ৬০০০ টাকা মূলধন নিয়ে কারখানাটির কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

(খ) চশমার ফ্রেম—ওসাকার খুব ছোট একটি কারখানায় বছরে প্রায় ৩০,০০০ ডজন সেলুলয়েডের ফ্রেম তৈরি হয়। এই কারখানায় ৪০ লোক কাজ করে এবং প্রায় ১০০ গৃহ-শিল্পী (home workers) এদের কাজে সাহায্য করে।

৫। হাতে সেলাইয়ের স্থচ

অ্যাটম বোমা-বিধ্বস্ত হিরোসিমা থেকে বৎসরে প্রায় আড়াই কোটি টাকার স্থচ বিদেশে চালান যাচ্ছে। ভারতেও হিরোসিমা থেকে প্রায় আশি লক্ষ টাকার স্থচ আমদানি হয়। স্থচ শিল্পে নিযুক্ত হিরোসিমার ৮০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৫০০০ হচ্ছে মহিলা-কর্মী।

বিদ্যুৎচালিত অটোমেটিক মেশিনে নরম লোহার তার টুকরো করে কেটে নেওয়া হয়। ৫ ইঞ্চি ব্যাসের দুটি শক্ত লোহার বালার মধ্যে পুরে টুকরোগুলিকে বাণ্ডিল করে রাখা হয়। তারপর কয়লার আগুনে গরম হয়ে তারগুলি যখন লাল টকটকে হয় তখন সেগুলিকে ভারী লোহার রোলারের নিচে গড়িয়ে নিয়ে সোজা করা হয়।

বিদ্যুৎ চালিত মেশিনের সাহায্যে তারের টুকরোগুলির দুই মাথা সরু এবং ধারালো করা হবে। তারপর প্রত্যেক টুকরোর মাঝখান নরম করে নিয়ে যে অটোমেটিক মেশিনে

ফেলা হয়, তাতে টুকরোটির মাঝখানটা সূচের গোড়ার আকারে চ্যাপটা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুপাশে দুটো ছিদ্র হয়ে মধ্যে কেটে দুটো সূচের খণ্ড হয়ে বেরিয়ে আসবে। এক টুকরো তার থেকে এই ভাবে দুটো সূচ তৈরি হয়। হাতে সেলাইয়ের সূচের একটি ছোট কারখানা করতে প্রায় ১৬০০০ টাকার যন্ত্রপাতি লাগে।

৬। পুতুল তৈরি

ভারতের ন্যায় জাপানও পুতুল-শিল্পে আমেরিকা থেকে বছরে বহু ডলার আয় করে। ভারতের সাড়ে তিন টাকা দামের একটি পুতুল আমেরিকার বাজারে ৫ থেকে ১০ ডলার মূল্যে বিক্রয় হয়। জাপানের লক্ষাধিক লোক, কেউ বা পুরোপুরি, কেউবা আংশিক সময়ে, পুতুল তৈরির কাজে নিযুক্ত আছে।

৭। ঝিনুকের বোতাম

পাঞ্চ (Punch) মেশিনে ঝিনুক থেকে গোল টুকরো কেটে বের করা হয়। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে টুকরোগুলিকে বোতামের আকার দেওয়া হয় এবং বৈদ্যুতিক ড্রিলের সাহায্যে বোতামে ছিদ্র করা হয়। এরপর পালিশ করার জন্য একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের (Drum) রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে বোতামগুলি ফেলা হবে। তারপর কস্টিক সোডা দ্রবণের বাষ্পের মধ্যে এগুলি কিছুক্ষণ রেখে পুনরায় আর একটি ঘূর্ণায়মাণ ড্রামের রাসায়নিক মিশ্রণের মধ্যে

ফেলে বোতামগুলিকে উজ্জ্বল করা হয়। ওসাকা শহরের নিকটবর্তী একটি কারখানায় মাত্র ১০ জন শ্রমিক নিয়ে মাসে ৩৪৪৫৬০০০ বোতাম তৈরী হয়। বছরে কয়েক লক্ষ টাকার জাপানী বোতাম ভারতে আমদানি হয়। ঝিনুকের বোতাম তৈরির একটি ছোট কারখানায় প্রায় ১০০০০ টাকার যন্ত্রপাতি দরকার হয়।

৮। বাল্‌ব তৈরী

টোকিও শহরে বড় কারখানাগুলি ছাড়াও প্রায় ৫০টি ছোট ছোট বাল্‌ব তৈরির কারখানা আছে। একটি কারখানায় ১৬ জন শ্রমিক মাসে ৫০০০০ বাল্‌ব তৈরি করে। এরা বাল্‌বের উপরকার কাঁচের আবরণ ও তার মুখের 'সকেট' (Socket) বাইরে থেকে কিনে আনে। নিজেদের কারখানায় এরা বাল্‌বের ভিতরকার কাচের নলটি তৈরি করে তার সঙ্গে 'ফিলামেণ্ট' (filament) যুক্ত করে। একটি ঘূর্ণায়মান মেশিনের ৪।৫টি গ্যাস-আগুনের (gas flames) উপর ফেলে বাল্‌বের উপরকার আবরণের সঙ্গে ভিতরকার নলটি জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর বাল্‌বটিকে বায়ু ও জলীয় বাষ্প শূন্য করে মুখ 'সীল' করে এটে দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর এই কারখানাটি মাত্র ৫০০০ টাকার যন্ত্রপাতি নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল; পরবর্তী ৪ বৎসরে এর মূলধন দাঁড়িয়েছে ৫০০০০ টাকা।

অনেক ছোট কারখানায় টর্চের বালব তৈরি হয়। কাঁচের

নল, তামার তার, টাংস্টেন ফিলামেণ্ট, পিতলের 'সকেট' (Socket) ও সীসা, এই সব কাঁচামাল দিয়ে ছয়জন লোকের একটি কারখানায় দৈনিক ২০০০ বালব তৈরি হয়। এখানে কাঁচের নল থেকে বালব তৈরি ও ফিলামেণ্ট (filament) লাগানোর কাজ সাধারণ গ্যাস-আগুনেই হয়ে থাকে।

৯। ফাউণ্টেন পেন

টোকিওর একটি কারখানায় বারজন শ্রমিক কাজ করে মাসে ৫০০ ডজন ফাউণ্টেন পেন তৈরি করে। রবার ও সেলুলয়েডের নল, নিব ও নিবের সঙ্গে যুক্ত অংশ সমস্তই পৃথক কারখানায় তৈরি হয়। এই কারখানায় কেবল বিভিন্ন অংশগুলি জুড়ে ফাউণ্টেন পেন তৈরি করা হয় এবং বাজারে এগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।

১০। কাগজের জিনিস

জাপানে কাগজ থেকে ৩০০ রকমের জিনিস তৈরি হয়। লম্বা ফিতার আকারে কাগজ কেটে নিয়ে তাকে পাকিয়ে কাগজের সূতা তৈরি হয়। এই সূতা যাতে জলে ভিজে নষ্ট না হতে পারে, এজন্য একে সেলুলোজ মিশ্রণে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। কাগজের সূতা থেকে বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, তোয়ালে, ব্যাগ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিনিস জাপানে তৈরি হয়।

১১। ছাতা তৈরি

জাপান থেকে বৎসরে বহু টাকার ছাতার 'শিক' (umbrella ribs) ভারতে আসে। এগুলি সহজেই আমাদের দেশে তৈরি হতে পারে।

জাপানে একমাত্র টোকিও শহরে ১৫০ ছাতার কারখানা আছে। টোকিওর ২৫টি কারখানায় শুধু ছাতার 'শিক' (ribs) তৈরি হয়। ভারত সরকারের প্রতিনিধিদ্বয় ছাতার শিক তৈরির একটি কারখানা দেখেছিলেন। এই কারখানায় মাত্র ১২টি লোক কাজ করে। অন্য কারখানা থেকে এরা লোহার শিক (carbon steel rods) কিনে আনে, তারপর এই শিক থেকে নিজেরা ছাতার ফ্রেম (umbrella ribs) তৈরি করে। এই কারখানায় ২০ রকমের যন্ত্রপাতি আছে। কয়েকটি যন্ত্র একটু জটিল ধরনের। কারখানার কর্মীরা নিজেরাই এই যন্ত্র কয়েকটি উদ্ভাবন করেছেন। কারখানার মোট যন্ত্রপাতির দাম প্রায় ১২০০০ টাকা।

১২। ববিন তৈরি

বিদেশ থেকে বহু টাকার ববিন ভারতে আমদানি হয়। জাপানে বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রে ববিন তৈরি হয়। জাপানের একটি কারখানায় ববিন তৈরিতে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় তার মূল্য প্রায় ১৫০০০ টাকা। ভারতে এই শিল্পের প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

১৩। টুথ ব্রাশ

ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান থেকে ভারতে টুথ ব্রাশ আমদানি হয়। জাপানের ঘরোয়া কারখানায় (home factory) বাঁশ অথবা সেলুলয়েডের হাতল দিয়ে সস্তা টুথ ব্রাশ তৈরি হয়।

১৪। সাইকেল শিল্প

বাইসিকেল তৈরি জাপানের আর একটি ক্ষুদ্র শিল্প। এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন কাজ করে এমন সব কারখানায় যার প্রত্যেকটিতে ৩।৪ জনের বেশী লোক কাজ করে না। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্র জুড়ে একটি গোটা সাইকেল তৈরি হয়। জাপানের এক একটি ছোট কারখানায় সাইকেলের একটি বা দুটি মাত্র অংশ তৈরি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাইকেলের একটি অংশও কয়েকটি কারখানায় ভাগ করে পর পর তৈরি হয়। অতি সামান্য সংখ্যক কারখানাতেই সাইকেলের দুটির বেশী অংশ তৈরি হয়। কাজেই অতি সামান্য মূলধনেই সাইকেলের অংশ তৈরির একটি ছোট কারখানা খোলা যায়। বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন কারখানায় তৈরি হবার পর একটি বৃহৎ কারখানায় এগুলি একত্র জুড়ে একটি গোটা সাইকেল বিক্রির জন্য প্রস্তুত হয়।

জাপানের নাগোয়া শহরে সাইকেলের অংশ তৈরির জন্য প্রায় এক হাজার কারখানা আছে। এর মধ্যে ছোট

কারখানার সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৭০০, এবং এদের ৩৫০টি কারখানায় মাত্র ৪ অথবা ৫ জন লোক কাজ করে। নাগোয়া শহরে মাত্র ১০টি বৃহৎ কারখানায় গোটা সাইকেল প্রস্তুত হয় এবং বৃহত্তম কারখানাটিতে প্রায় ২০০০ লোক কাজ করে। ছোট কারখানাগুলি বড় কারখানার সহযোগী (ancillary) হিসাবে কাজ করে। বৃহৎ কারখানা সাইকেলের 'ডিজাইন' ও প্ল্যান তৈরি করে এবং বিভিন্ন অংশ তৈরি করবার জন্য বিভিন্ন ছোট কারখানাতে কাঁচা মাল সরবরাহ করে।

১৫। কলের খেলনা (Mechanical Toys)

জাপানী কলের খেলনা সারা পৃথিবীর বাজারে ছেয়ে ফেলেছে। জাপানের কয়েক হাজার ঘরোয়া-কারখানায় খালি টিনের পাত্র কেটে কেটে বছরে কোটি কোটি কলের খেলনা তৈরি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানে অবস্থান কালে আমেরিকান সৈন্যেরা খাবার খেয়ে যে টিনের কৌটাগুলি রাস্তার ডাষ্টবিনে ফেলে দিত, সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে জাপানীরা তা থেকে টিনের পাত কেটে নিয়ে রঙ চঙ করে লক্ষ লক্ষ টাকার কলের খেলনা তৈরি করেছে। এই শিল্পে মেয়েরাই বেশীর ভাগ কাজ করে, যন্ত্রপাতি এবং মূলধনও খুব বেশী দরকার হয় না।

১৬। তেলের ঘানি

জাপানে নানাধরনের তেলের ঘানি আছে। কতকগুলি

হাতে চলে, কতকগুলি মৃদু বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। ধান ভেনে চাল বের করে নেবার পর যে ভুষি পড়ে থাকে, আমাদের দেশে তা প্রায়ই নষ্ট হয়। কিন্তু জাপানের তেলের ঘানি সম্পর্কে মজার খবর এই যে, সেখানে ঘানিতে ফেলে এই ভূষি থেকেও তেল বের করা হয়। চালের ভূষির তেল (rice bran oil) সাবান, রঙ, মলম, মোবিল অয়েল প্রভৃতি তৈরির কাজে লাগে। জাপানের সরকারী কৃষি-বিভাগ থেকে চালের ভূষি সংগ্রহ করে তেল তৈরি করবার জন্য গ্রামাঞ্চলের ঘানিগুলিতে সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে।

জাপানের অসংখ্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাত্র কয়েকটির পরিচয় এখানে দেওয়া হল। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে জাপানের বিপুল সফলতার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি রয়েছে—

(১) দেশের সর্বত্র সস্তা দরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ

(২) দেশব্যাপী শিল্প-শিক্ষা ব্যবস্থা—শিল্পীদের কর্মদক্ষতা

(৩) শিল্প-গবেষণা—দেশ ও বিদেশের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী নূতন শিল্পের প্রবর্তন এবং পুরাতন শিল্পের টেকনিক ও ডিজাইনের পরিবর্তন সাধন

(৪) শিল্প সম্পর্কে দেশে বিদেশে প্রচার ও বিক্রয় ব্যবস্থা

(৫) উৎপাদনে মিতব্যয়িতা—সুলভ শ্রম

(৬) ঘরোয়া-কারখানার কর্মীদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় সম্প্রীতি ও যোগাযোগ

(৭) ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের সহযোগিতা

জাপানে শিল্প-শিক্ষাঃ—জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিল্প-শিক্ষার অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে শিল্পবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রবেশ করতে জাপানের ছেলেমেয়েদের ছয় বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, তিন বৎসর মধ্য বিদ্যালয়ে এবং তিনবৎসর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা এই ভাবে ১৮-১৯ বৎসর বয়সে এসে কলেজে ভর্তি হয় এবং তিন বৎসর সেখানে অধ্যয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়েয় পাঠ শেষ করে। জাপানের টেকনিক্যাল হাই স্কুলগুলিতে বয়ন শিল্প, রঙ-শিল্প, মৃৎশিল্প ও কাঁচশিল্প, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক শিল্প-বিজ্ঞান (chemical engineering) ইত্যাদি শেখানো হয়। এখানে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে অঙ্ক, ইতিহাস, রসায়নশাস্ত্র, জাপানী ভাষা ও একটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়। বিদ্যালয়ের অর্ধেক সময় সাধারণ বিষয় সমূহ এবং বাকী অর্ধেক সময় শিল্প (technical) বিষয় সমূহের অধ্যাপনায় ব্যয় হয়।

টেকনিক্যাল হাইস্কুল ছাড়া জাপানে শিল্প-কলা (Industrial Arts) শিক্ষার জন্যও অনেকগুলি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এখানেও ছাত্রেরা সাধারণ বিষয় সমূহের সঙ্গে (যথা, সমাজ বিজ্ঞান, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জাপানী ভাষা, ইংরাজী ভাষা ও ইতিহাস) হাতের কাজ ও চারু-কলা (fine arts) সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে। ধাতু-শিল্প, কাঠের কাজ, বয়ন শিল্পের নূতন নূতন ডিজাইন, স্থপতি কলা এবং দেশী ও বিদেশী

চিত্র-শিল্পের যে কোন একটি বিষয়ে ছাত্রেরা এখানে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করে।

জাপানে শিল্প শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি হল সেখানকার 'পলিটেকনিক স্কুল'গুলি। ছয় বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর ছাত্রেরা এখানে এসে ভর্তি হয়। পলিটেকনিক স্কুলের পাঠ শেষ করতে সাধারণত তিন বৎসর সময় লাগে। কতকগুলি পলিটেকনিক স্কুলে অধিকতর যোগ্যতা-সম্পন্ন ছাত্রদের ভর্তি করে পাঁচ বৎসরকাল যন্ত্র বিদ্যা, পূর্ত বিদ্যা বা স্থপতি বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার অনেকগুলি পলিটেকনিক স্কুলের ছাত্রেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠের পর বয়ন শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁচ শিল্প এবং অন্যান্য স্থানীয় শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পায়। হাতে কাগজ তৈরি, ঘড়ি তৈরি, ফটোগ্রাফী, খনির কাজ ও বৈদ্যুতিক তার ও কলকব্জার কাজ প্রভৃতি শেখাবার জন্য বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র বিদ্যালয় (special school) আছে। অনেকগুলি শিল্প-বিদ্যালয়ে সকালে, বিকালে এবং সন্ধ্যায় ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয় থেকে বছরে হাজার হাজার ছাত্র শিল্প-শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে আসে।

যে সব ছেলেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে কোন কারখানায় কাজের জন্য ঢুকে পড়ে, তাদের প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষাদানের জন্য জাপানে Industrial continuation schools রয়েছে। জাপানের সরকারী কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ থেকেও তাদের কর্মীদের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা আছে।

সমাজ-শিক্ষার মাধ্যমেও জাপানে শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, বেতার, চলচ্চিত্র, বক্তৃতা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে জনসাধারণ দেশের শিল্প-সংগঠনের সংবাদ পায়। প্রত্যেক শিল্পের তরফ থেকে প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করে জনসাধারণকে নূতন নূতন আবিষ্কার ও ডিজাইনের সন্ধান দেওয়া হয়। এই সব পত্রিকাগুলিতে এত ছবি থাকে এবং এগুলি এত সহজভাবে লেখা যে, ঘরোয়া-কারখানার কর্মীরা এগুলি পড়ে নূতন ডিজাইনগুলি অনায়াসে নিজেদের কারখানার কাজে লাগাতে পারে।

জাপানে শিল্প-গবেষণা :—জাপানের অধিকাংশ শহরে শিল্প-গবেষণাগার রয়েছে। এখানে কর্মীরা বিভিন্ন শিল্পের যন্ত্রপাতি, কর্মকৌশল ও ডিজাইনের উন্নতি সম্পর্কে গবেষণা করেন। প্রত্যেক গবেষণাগারের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী-গৃহ ও গ্রন্থাগার থাকে। প্রদর্শনী-গৃহে স্থানীয় সকল রকম শিল্প-দ্রব্যের আধুনিকতম নমুনা সাজিয়ে রাখা হয়। এই সকল নমুনাগুলি গবেষণাগারের নিজস্ব কারখানায় তৈরি হয় এবং এগুলি নির্মাণ করতে যে সব নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও জিনিস-পত্র ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলিও প্রদর্শনী-গৃহে দেখানো হয়। বিভিন্ন কারখানার কর্মীরা প্রদর্শনী-গৃহে এলে গবেষণাগারের কর্মচারিগণ তাদের সঙ্গে শিল্প-দ্রব্যগুলি তৈরির নূতন 'টেকনিক' ও ডিজাইন সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনেক সময় এই সব জিনিসের পাইকারী বিক্রেতারা প্রদর্শনী-গৃহে

এসে নমুনা দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করেন এবং দেশবিদেশের বাজারে এই জিনিসগুলি বিক্রি করবার সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত বা পরামর্শ দেন। প্রতি মাসে গবেষণাগারে স্থানীয় কারখানাগুলির মালিক ও কর্মীদের নিয়ে একটি সভা বসে; এই সভায় বিভিন্ন শিল্পের সমস্যা, 'টেকনিক' ও ডিজাইন সম্পর্কে আলোচনা চলে।

জাপানে সমাজকল্যাণ-কেন্দ্র :— দুঃস্থ মেয়েদের সাহায্যের জন্য জাপানের স্থানে স্থানে সমাজকল্যাণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই সকল সমাজকল্যাণ-কেন্দ্রে দরিদ্র, অসহায় স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ শিল্প-কাজ শেখে। শিল্প-শিক্ষার জন্য তাদের কোন ফী বা টাকা দিতে হয় না; অধিকন্তু, কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে শিল্পকাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু কিছু শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করে এবং এর জন্য গোড়া থেকেই তারা পারিশ্রমিক পায়। কাজ শেখা সম্পূর্ণ হবার পরও তারা এই সব কেন্দ্রে পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করতে থাকে। যে যত বেশী কাজ করতে পারে, তার পারিশ্রমিকও তত বেড়ে যায়। অনেক মহিলা-কর্মী কেন্দ্রের জিনিসপত্র নিয়ে নিজেদের বাড়িতে বসে কাজ করে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কেন্দ্রে জমা দিয়ে পারিশ্রমিক পায়। দর্জির কাজ, সুতা ও লেস তৈরি, পশমী জামা তৈরি, মোজা ও দস্তানা তৈরি এমব্রয়ডারি কাজ, ছাপাখানার কাজ, কাগজের ফুল ও মুখোস তৈরি, কাপড়ের টুকরো ও পাখির পালক দিয়ে সেলুলয়েডের পুতুলের পোশাক তৈরি, গন্ধ-তেল, ক্রীম,

পাউডার প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য তৈরি, ট্রে তৈরি, মিষ্ট দ্রব্য তৈরি, হাতমেশিনের সাহায্যে রেডিয়োর ছোট স্প্রিং তৈরি, রেডিও, সেলাই কল এবং ঘড়ি মেরামতের কাজ, ইত্যাদি নানা ধরনের শিল্প-কাজ এই সব সমাজকল্যাণ-কেন্দ্রে মহিলা-কর্মীরা করে থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বাজারে বিক্রির জন্য কেন্দ্রের কর্মী অথবা কর্তৃপক্ষ কাউকেই ভাবতে হয় না। কর্তৃপক্ষ বাজারের বড় ব্যবসায়ী বা উৎপাদন-কারীদের নিকট থেকে এই সব শিল্পদ্রব্যের অর্ডার সংগ্রহ করেন। অনেক সময় ব্যবসায়ীরা সমাজকল্যাণ-কেন্দ্রে তাদের লোক পাঠিয়ে জিনিসগুলির নমুনা ও ডিজাইন সম্পর্কে কর্মীদের পরামর্শ দিয়ে থাকে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আমাদের দেশেরও বিভিন্ন স্থানে মহিলা কর্মীদের জন্য এই ধরনের সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বাজারে বিক্রির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেছেন। সম্প্রতি আরও ব্যাপক ভাবে এরূপ সমাজকল্যাণ কেন্দ্র গঠনের চেষ্টা চলছে।

বিদেশের বাজারে জাপানের মত ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যগুলিরও চাহিদা বাড়াতে চেষ্টা করতে হবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন শিল্পের গবেষণাগার স্থাপনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বিদেশ থেকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতিও ভারত সরকার আমদানি করছেন। অনেকগুলি রাষ্ট্রে ভারতীয় দূতাবাসে

ভারতীয় কুটির শিল্পদ্রব্যের নমুনাগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকা, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রেলিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নাইজিরিরিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার প্রদর্শনীগুলিতে ভারতীয় কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যগুলি দেখানো হয়েছে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা দেবার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞ বা টেকনিশিয়ান নিযুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল পেতে হলে এই কাজগুলি আরও ব্যাপকভাবে করা প্রয়োজন। বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অথবা বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মারফতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের বহুল প্রচার ও কাটতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ভ্রমণকারীদের মারফতে যাতে ভারতীয় শিল্প-দ্রব্যের বিদেশে প্রচার হয়, এই উদ্দেশ্যে ভারতের এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের বড় বড় শহরের হোটেলগুলিতে ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের নমুনা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার। ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিগণ বৈদেশিক রাষ্ট্র-গুলির কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও ঐ সম্পর্কে প্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তিকাগুলি ভারত সরকারের নিকট পাঠাতে পারেন। এইভাবে অন্য দেশগুলির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে আমরা আমাদের দেশের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনে অগ্রসর হতে পারি।

কয়েকটি কুটির শিল্পের কথা

হস্ত চালিত তাঁত-শিল্প

তাঁতশিল্পের অনেক কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই কৃষি-শিল্পের পরেই তাঁত-শিল্পের স্থান। ভারতে ৫০ লক্ষেরও বেশী লোক হস্তচালিত তাঁতের কাজে জীবিকা অর্জন করে। সমগ্র দেশে বৎসরে যে পরিমাণ কাপড়ের প্রয়োজন হয় তার প্রায় সিকি ভাগ হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন হয়। সারা ভারতে বর্তমানে প্রায় ২৯ লক্ষ হস্তচালিত তাঁতে কাজ হয়। বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। একখানা তাঁতে একমাসে একশ থেকে দেড়শ গজ কাপড় তৈরি হতে পারে। ১৯৫৬ খৃঃ ভারতের হস্তচালিত তাঁতে মোট উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ হচ্ছে ১৫৪ কোটি গজ। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আরও ৩০ কোটি গজ বেশী উৎপাদন হবে আশা করা যায়।

হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের সমবায় সমিতিগুলিকে সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেন।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির ফলে হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ আশানুরূপ বেড়ে যাবে ঃ—

(১) উন্নত ধরণের তাঁতের ব্যবহার। পুরানো ধরনের হাতে ঠেলা তাঁতের (Throw shuttle loom) পরিবর্তে ঠকঠকি তাঁত, সেমি অটোমেটিক ও অটোমেটিক তাঁতের ব্যবহারে উৎপাদন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

(২) সূতার অভাবে যাতে তাঁতিদের বসে থাকতে না হয় এজন্য ভারতসরকার নিয়ম করেছেন যে, প্রত্যেক কাপড়ের মিল থেকে উৎপন্ন সূতার একটা অংশ হস্ত-চালিত তাঁতের কাজে সরবরাহ করতে হবে। তাঁতিদের প্রয়োজন এতেও মিটতে না পারে বলে তাঁত-শিল্পের জন্য কতকগুলি সমবায় সূতা-কল (Co-opertive spnining Mills) স্থাপিত হচ্ছে।

(৩) বস্ত্র বয়নের কাজে মামুলি প্রথায় সূতার টানা ও পরেন তৈরি করতে তাঁতিদের বহু পরিশ্রম হয় ও সময় নষ্ট নয়। টানা তৈরির জন্য বর্তমানে তাঁতিরা অবশ্য অল্প টাকা মূল্যের সাধারণ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয় যদি টানা ও পরেন তৈরির জন্য আদৌ তাঁতিদের খাটতে না হয়। নিকটবর্তী কোন কাপড়ের মিল থেকে তাঁতিরা যদি টানা সূতার ready, sized beam পায়, তাহলে তাঁতিদের আর টানার জন্য খাটতে হয় না এবং তারা অতি অল্প সময়ে উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করতে পারে। কলিকাতার নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলে হস্তচালিত

তাঁতগুলির জন্য নিকটবর্তী কাপড়ের মিল থেকে এরূপ ready sized beam সরবরাহের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলের তাঁতিদের এই সুযোগ নাই। ফেটির আকারে গুটানো সূতার পরেন তৈরি করতে তাঁতিদের বহু সময় ব্যয় হয় এবং অনেক সূতা নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে মিল থেকে ববিনে গুটানো নানা রকমের সূতা তাঁতিরা কিনে নিয়ে সহজে কাজ করতে পারে এবং খালি ববিনগুলি মিলে ফেরৎ দিয়ে আবার নূতন সূতা আনতে পারে। তাঁতিদের আর একটি প্রয়োজন ক্যালেণ্ডার মেসিনের। মিলের নিকটবর্তী হস্তচালিত তাঁতের কাপড় তাঁতিরা মিল থেকে পাইকারী হারে ক্যালেণ্ডার করে নিতে পারে। ফলে তাদের কাপড়গুলি মিলের কাপড়ের মতই দেখতে সুন্দর হয়। কিন্তু মফঃস্বলের তাঁতিদের এ সুবিধা নাই। এই সব অবস্থা বিবেচনা করে যাতে পল্লীর তাঁতিরা কাপড়ের মিল থেকে পূর্বোক্ত সুযোগগুলি পেতে পারে এরূপ যোগাযোগও বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। যে সব গ্রামাঞ্চলে নিকটে কোন কাপড়ের মিল নাই, অথচ কমপক্ষে হাজার খানেক হস্তচালিত তাঁতে কাপড় তৈরি হচ্ছে, সেখানে তাঁতিদের সমবার সমিতি থেকে এই সব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি করে কারখানা গড়ে তুলতে হবে।

কাপড়ের সূতা রং করা তাঁতিদের আর একটি সমস্যা। এজন্য নানাস্থানে সূতা রং করার কারখানা স্থাপিত হচ্ছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি প্রধানতঃ নির্ভর করে বাজারের চাহিদা বৃদ্ধির উপর। কাজেই একদিকে যেমন তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন বাড়াতে হবে অন্যদিকে বাজারে তার বিক্রিও বাড়াতে হবে। দেশে এবং বিদেশে ভারতের হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং বিদেশের বাজারে ভারতীয় তাঁত বস্ত্রের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society গঠন করেছেন। সম্প্রতি আমেরিকা, ইংলণ্ড, সিংহল, মলয় এবং সুদান প্রভৃতি দেশে ভারতের তাঁত বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই চাহিদাকে আশানুরূপ বাড়াতে হলে দেশ বিদেশের লোকের রুচি অনুযায়ী নূতন নূতন ডিজাইন দিয়ে কাপড় তৈরি করতে হবে। এজন্য ভারত সরকার বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, বেনারস, কাঞ্চীপুরম, চান্দেরী এবং সুরাট প্রভৃতি স্থানে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের প্রধান নক্‌সা কেন্দ্র (Design Centres) স্থাপন করতে চেয়েছেন। রাজ্য সরকার থেকেও বহু নক্‌সা কেন্দ্র খোলা হবে। নূতন নূতন ডিজাইনের উৎকৃষ্ট কাপড় হস্তচালিত তাঁতে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রে এর চাহিদা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে, ফলে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের ডলার উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁতের কাজে আরও বহু বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

রেশম শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প প্রসঙ্গে রেশম শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। জাপানীরা প্রত্যেক পতিত ভূমিখণ্ডে রেশম চাষের জন্য তুঁত গাছ রোপণ করেছে। জাপানের প্রত্যেক বাড়িতেই বাগান এবং রেশম পোকা পালনের অতিরিক্ত ঘর আছে। এভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে জাপান রেশম উৎপাদনে বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। বাংলাদেশের জমি ও জলবায়ু রেশম চাষের অনুকূল। জাপানের ন্যায় বাংলারও গ্রামে গ্রামে রেশম চাষের চেষ্টা হলে এই কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন হবে এবং গ্রামের লোকের দারিদ্র্য দূর হবে। রেশম চাষের সুবিধা এই যে, পুরুষ স্ত্রীলোক এবং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ সকলেই এই কাজে নিযুক্ত হতে পারে। মহীশূর এবং কাশ্মীরে সরকার থেকে গৃহস্থদের রেশম পোকার ডিম বিতরণ করা হয়। সেখানে সাধারণ পরিবারের বহু লোক রেশম পোকা পালনের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। আমাদের দেশে রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ—

(১) রেশম পোকাগুলিকে রোগমুক্ত করবার জন্য এবং সুস্থ ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম বীজ উৎপাদনের জন্য গবেষণা।

(২) রেশম পোকা পালন ও গুটি থেকে রেশম বের করবার প্রণালী সম্পর্কে কর্মীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশ দান।

(৩) রেশম বস্ত্র বয়নের জন্য তাঁতিরা সাধারণত হাতে-

ঠেলা তাঁত (Throw shuttle looms) ব্যবহার করে। তাদের ধারণা যে উন্নত ধরনের তাঁতে রেশম ও তসর বয়ন করা চলে না। অতএব তাঁতিদের এই ভুল ধারণা দূর করে রেশম বয়নে উন্নত ধরনের তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা দিতে হবে।

(৪) সাধারণ রেশম বয়নকারীদের রেশম বস্ত্রের রং ও ধোলাই সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নাই। সুতরাং বয়নকারীরা যাতে ভাল রং পেতে পারে এবং তার ব্যবহারের কৌশল শিখতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) রেশম শিল্পে উন্নত ধরনের নকশার প্রবর্তন।

(৬) দরিদ্র রেশম শিল্পীদের মহাজনের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন।

পশ্চিমবঙ্গে বহরমপুরের সরকারী রেশম বয়ন বিদ্যালয়টি উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে রেশম শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেশম চাষ ও শিল্পের প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিখিল ভারত রেশম বোর্ড, নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড এবং নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম শিল্প-বোর্ড দেশে রেশমের চাষ, রেশম-বস্ত্র বয়ন ও বিক্রয় সম্বন্ধে সহযোগিতা করছেন। নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম-শিল্প বোর্ডের পরিচালনায় যে রেশম খাদি উৎপন্ন হচ্ছে তার বিক্রয়ের উপর সরকারী অর্থে টাকা প্রতি তিন আনা হারে কমিশন দেওয়া হচ্ছে। নিখিল

ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড রেশমবস্ত্র বয়নকারীদের প্রতিটি তাঁতের জন্য পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। নিখিল ভারত রেশম বোর্ডের চেষ্টায় ভারতে উৎপন্ন খাঁটি রেশমের মূল্য পাউণ্ড প্রতি ২৫৲ টাকা থেকে ৩৫৲ টাকার মধ্যে মোটামুটি স্থিরতা লাভ করেছে। এতে রেশম উৎপাদনকারীদের অনেকটা সুবিধা হয়েছে। কিন্তু রেশমবয়নকারীদের বিপদ কাটেনি। রেয়ন থেকে প্রস্তুত কৃত্রিম রেশম বাজারে আমদানি হয়ে খাঁটি রেশমবস্ত্রের বিক্রয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এক পাউণ্ড রেয়নের মূল্য যেখানে মাত্র চার টাকা এক পাউণ্ড রেশমের মূল্য সেখানে ৩০/৩৫৲ টাকা। সুতরাং রেশম-বস্ত্র-বয়নকারীরা কিছুতেই কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। ফলে বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে রেশম বয়নকারীর সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ খ্রীঃ বিষ্ণুপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের প্রায় চারশ' রেশম বয়নকারীদের সরকার থেকে সাহায্য দিয়ে বাঁচাতে হয়েছে। যা হোক, বর্তমানে এই অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা হচ্ছে। জনসাধারণ কৃত্রিম রেশম (রেয়ন) ও খাঁটি রেশমের পার্থক্য বুঝতে পারলে রেয়নের প্রতিযোগিতায় রেশমশিল্পের বিপদ অনেকটা কেটে যাবে। এ সম্বন্ধে রেশমশিল্পের তরফ থেকে প্রচারকার্যের প্রয়োজন। এছাড়া সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের উৎকৃষ্টতর রেশমবস্ত্র তৈরি করতে পারলে বিদেশের বাজারেও ভারতীয় রেশম দ্রব্যের বিপুল সমাদর হবে।

ডুরি ও কার্পেট শিল্প

বাংলা দেশে বহুদিন থেকে ডুরি বা সতরঞ্জি বয়ন চলে আসছে। আধুনিক ধরনে ডুরি ও কার্পেটগুলি তৈরি করতে বয়ন ও পুঁটতোলা, দুয়েরই দরকার হয়। ভারতের প্রাচীন কারুকার্যগুলির নানা রকম বিচিত্র নকশাও এতে তোলা হয়। ডুরি ও কার্পেট শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নানারকম রংয়ের সামঞ্জস্য করে এগুলি বয়ন করা। গালিচা ও দুলিচা নামে ফুঁপিতোলা কার্পেটও এদেশে মুসলমান শাসকগণের আমল থেকে তৈরি হয়ে আসছে। গালিচার ফুঁপি পশম দিয়ে এবং দুলিচার ফুঁপি কার্পাস দিয়ে তৈরি হয়।

আধুনিক সমাজে ডুরি ও কার্পেটের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। সুতরাং এই শিল্পে লাভের সুযোগ আছে। কিন্তু বাংলার ডুরিবয়নকারিগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশের ডুরি ও কার্পেট বয়নকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। আগ্রার কার্পেট টেকসই বলে বিখ্যাত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ডুরি ও কার্পেট শিল্পের উন্নতির জন্য রাজ্যসরকার চেষ্টা করছেন। কলিকাতার আশেপাশে অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক বর্তমানে এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। অতএব বাংলার ডুরি ও কার্পেট শিল্প আগ্রার ডুরি ও কার্পেটের মত সর্বত্র সমাদর লাভ না করবার কোন কারণ নাই।

নারিকেল ছোবড়ার শিল্প

এই শিল্পটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নারিকেলের ছোবড়া থেকে তৈরি দড়ি, পাপোশ ও মাতুর প্রভৃতি ভারত হতে ইউরোপের বাজারে বিগত কয়েক শ' বছর ধরে রপ্তানি হয়ে আসছে। এই শিল্পে ভারতের কোটি কোটি টাকা আয় হচ্ছে। সিংহল এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও নারিকেল ছোবড়ার সূতা তৈরি হয়। কিন্তু ভারতে তৈরি সুতা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে বিদেশে এর আদর বেশী। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নারিকেলের ছোবড়া থেকে পাপোশ, গালিচা ও মাতুরাদি তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তথাপি বিভিন্ন দেশের রুচি অনুযায়ী নূতন নূতন নকশা দিয়ে যদি ভারতে এগুলি তৈরি করা যায় তবে আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে এগুলির চাহিদা কমবে না, আশা করা যায়।

দক্ষিণ ভারতে মালাবার উপকূলের হাজার হাজার লোক এই কাজে নিযুক্ত আছে। কেবলমাত্র কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরেই দুই লক্ষেরও বেশী লোক এই কাজ করে এবং শ্রমিকদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

নারিকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি, পাপোশ ও মাতুর তৈরির কাজটি খুব সহজ এবং সামান্য মূলধনে এই শিল্প আরম্ভ করা যায়। নারিকেলের খোসাগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে অল্পবিস্তর লোনাজলে কয়েকমাস ভিজিয়ে রাখতে হয়। ছ'মাস থেকে একবৎসর কাল, অর্থাৎ খোসাগুলি সম্পূর্ণ নরম না হওয়া পর্যন্ত জলে ভেজানো থাকে; তারপর খোসাগুলি তুলে নিয়ে

তন্তু বের করা হয়। তন্তুগুলিকে ছোটবড় শ্রেণীতে পৃথক করে নিয়ে, বড় তন্তু থেকে সূতা এবং খাটো তন্তু থেকে বুরুশ, পাপোশ ইত্যাদি তৈরি হয়। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে এই শিল্পের আশানুরূপ বিস্তার আজও হয় নাই। কলিকাতার রাস্তায় প্রতিদিন হাজার হাজার খালি নারিকেল ফেলে দেওয়া হয়। প্রতিদিন সামান্য আরামের জন্য হাজার হাজার ডাবের জল পান করে আমরা হাজার হাজার টাকার জাতীয় সম্পদ হেলায় নষ্ট করছি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হাওড়া এবং চব্বিশ পরগনা জেলাগুলিতে লোনাজলের অভাব নাই। এইসব জেলার গ্রামগুলিতে অনায়াসে সামান্য মূলধনে আমরা এই শিল্পকে গড়ে তুলে লাভবান হতে পারি। নারিকেলের ছোবড়া শিল্প ছাড়াও নারিকেল থেকে তেল ও মাখন তৈরি করতে পারি। নারিকেলের শুকনো শাঁস বহুপরিমাণে বিদেশে চালান দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে তা থেকে তেল তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করলে আমরা অধিকতর লাভবান হতে পারি। নারিকেলের তেল ইউরোপে নানারকম শৌখিন প্রসাধন, মোমবাতি, সাবান এবং কৃত্রিম মাখন উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হয়। নারিকেলের খোলের মূল্যও কম নয়। এদেশে খোলগুলি সাধারণত হুকা তৈরির কাজে লাগে, কিন্তু এই খোল থেকে অতি সুন্দর এবং সস্তা বোতাম তৈরি হতে পারে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে অতি সহজে এবং সামান্য মূলধনে নারিকেলের এই শিল্পগুলি গড়ে তোলা সম্ভবপর।

হোসিয়ারী ও কাটা কাপড়ের শিল্প

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশে হোসিয়ারী শিল্পের প্রবর্তন হয়। জাপানের গেঞ্জি এক সময়ে সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল, কিন্তু এখন দেশে প্রস্তুত মোজা, গেঞ্জি, জারসি, পুলওভার প্রভৃতি দ্রব্য ঘরে ঘরে স্থান পাচ্ছে। কলিকাতা ও তার আশেপাশে বহু ছোট ছোট গেঞ্জির কারখানা গড়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গে পাবনা শহরেও এরূপ অনেক গেঞ্জির কারখানা আছে। যে সব শহরে বা গ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তার হয়েছে সেখানে ১৫।১৬ হাজার টাকার মধ্যে গেঞ্জি তৈরির একটি ছোট কারখানা গড়ে তোলা যায়। যে সব অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি নাই, সেখানে হাতে বোনবার মেশিনে মোজা ও পুলওভার, মাফ্‌লার প্রভৃতি উৎপন্ন করা যায়। এই সব মেশিনের দামও খুব বেশী নয়।

মফঃস্বলের বহু পল্লীতে কুটির-শিল্প হিসাবে গৃহস্থেরা ঘরে বসে কোট, শার্ট, পাঞ্জাবি, প্যাণ্ট, ফ্রক, ব্লাউজ, সেমিজ ইত্যাদি তৈরি করে। মহাজনেরা এদের প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ করে এবং জামা তৈরির পর সামান্য মজুরি দিয়ে জিনিসগুলি নিয়ে আসে। এই মজুরির হার অত্যন্ত কম। একাজের শ্রমিকেরা পল্লীতে পল্লীতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যদি সমবায় সমিতি গঠন করে তাহলে এই সমিতির মারফতে নিজেদের তৈরি দ্রব্য শহরে এনে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে। এই কাজ তখন গ্রামের দুঃস্থ মেয়ে ও পুরুষদের একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত হবে।

পিতল-কাঁসার শিল্প

কুটির-শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁতের পরেই পিতল ও কাঁসার শিল্পের স্থান। কিন্তু বর্তমানে সস্তা অ্যালুমিনিয়াম ও এনামেলের জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই শিল্প পিছিয়ে পড়ছে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশপরগনা, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই শিল্প বহুকাল ধরে চলে আসছে। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের বাসনপত্র উৎকৃষ্ট পালিস এবং গঠনের জন্য বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়ার বাসনপত্র বিখ্যাত। কিন্তু এই শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে কারিগরদের অজ্ঞতা এবং মহাজনদের শোষণ। মহাজনেরা সামান্য মজুরি দিয়ে কারিগরদের খাটিয়ে নেয় এবং নিজেরা অর্থশালী হয়। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর শ্রমিকেরা কঠোর পরিশ্রম করেও এই শিল্প থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। অতএব এই শিল্পের উন্নতির জন্য শ্রমিকদের সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় মূলধন ও পাইকারী দরে কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই কাজ চালাবার জন্য শ্রমিকদের শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের এই শিল্পে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। শুধু পিতল-কাঁসার বাসনপত্র নয়, দরজার হাতল, কাগজ-চাপা, দেয়ালের তাক এবং অন্যান্য নানাপ্রকার নূতন ধরনের জিনিস এই শিল্পে উৎপন্ন করতে হবে। প্রত্যেক

জেলায় এই শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির একটি মিউজিয়ম বা প্রদর্শনী গৃহ থাকবে। এইভাবে এই শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার সম্ভব হবে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এককালে অতি সমৃদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদের নবাববাড়িতে এবং বর্ধমানের রাজ-বাড়িতে বাঙালী কর্মকারের তৈরি অনেক পুরাতন অস্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। বর্ধমানের আটমাইল দূরে কামারপাড়া গ্রামে বহু কর্মকার বাস করে। এখান থেকে কয়েকজন কর্মকার এককালে মুর্শিদাবাদ গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করে। এইসব অস্ত্রশস্ত্র কামারপাড়ার কামারদেরই তৈরি বলে মনে করা যেতে পারে।

বর্তমানকালেও বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে কাঞ্চননগরের লৌহশিল্পীরা ছুরি, ক্ষুর ও কাঁচি তৈরির জন্য খ্যাতি লাভ করেছে। বাঁকুড়া জেলার শাহাসপুর গ্রামও ছুরি ও কাঁচি প্রভৃতি তৈরির জন্য বিখ্যাত। বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের দেশের এই শিল্প বিস্তার লাভ করতে পারছে না। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা এই শিল্পকে আরও উন্নত করা যায়। বাংলার পল্লী অঞ্চলের কামারেরা সাধারণতঃ লাঙলের লৌহফলক, কাস্তে, দাঁও, বটি, খন্তা, কুড়াল ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা অর্জন

করে। অবিভক্ত পাবনা জেলার একটি অঞ্চল থেকে কর্মকারেরা প্রচুর পরিমাণে পেরেক তৈরি করে কলিকাতায় চালান দিত। কলিকাতা থেকে লোহার শিক কিনে নিয়ে তারা পেরেক তৈরি করত, এবং এই শিল্পটি ঐ অঞ্চলের একটি লাভজনক ব্যবসায় ছিল। নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের কামারেরা বল্টু ও নাট তৈরি করত। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এই শিল্পগুলিকে সমবায় সমিতির মারফতে ভালভাবে গড়ে তোলা যায়। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও ছুরি ও কাঁচি, চিকিৎসকের অস্ত্রাদি, ক্ষুর এবং অন্যান্য লোহার জিনিসপত্র উৎপাদনে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে।

বোতাম শিল্প

অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলাতেই বোতামশিল্প প্রথমে বিস্তার লাভ করে। এখানে ঝিনুক, শিং, অ্যালুমিনিয়ম, পিতল ও তামা প্রভৃতি ধাতু থেকে বোতাম তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বোতাম তৈরির ১৪৫টি ছোটবড় কারখানা আছে। ছোট ছোট ঘরোয়া কারখানার প্রতিটির জন্য গড়ে দেড়শ টাকার সাজসরঞ্জাম দরকার হয়। ক্ষুদ্র-শিল্পের আকারে পশ্চিমবঙ্গে বোতাম তৈরির যে কয়েকটি কারখানা হয়েছে তার প্রতিটিতে গড়ে প্রায় আড়াই হাজার টাকার যন্ত্রপাতি লেগেছে।

বোতাম তৈরির কাজকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করা

যায়, যথা,—(১) ব্লাঙ্কিং, (২) গ্রাইণ্ডিং (৩) ফেসিং (৪) ড্রিলিং (৫) স্মুদিং (৬) কালারিং। এর মধ্যে দুই, পাঁচ ও ছয় নম্বর কাজগুলি সহজেই হাতে করা যায়। বাকি তিনটি কাজ করতে আধুনিক যন্ত্রপাতির আবশ্যক হয়। আমাদের দেশের বোতাম শিল্প এখনও তেমন অগ্রসর হয় নাই। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা অনায়াসে বোতাম তৈরির কাজকে একটি লাভজনক কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পে পরিণত করা যেতে পারে।

মৃৎশিল্প

কৃষ্ণনগরের মাটির মূর্তি শিল্পনৈপুণ্যের জন্য ভারত এবং ভারতের বাইরেও বহু দেশে খ্যাতিলাভ করেছে। কৃষ্ণনগরের অনুকরণে মাটির তৈরী দেবদেবীর মূর্তি এবং দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তি ও মহাপুরুষদের মূর্তি ক্রয়ের জন্য লোকের অভাব হয় না। সুতরাং এই শিল্পের ব্যাপক সংগঠন ও উন্নয়ন খুবই সম্ভব। কেওলিন বা চিনামাটির তৈরি চায়ের পেয়ালা, ফুলদানি, ও খেলনা প্রভৃতিও একটি লাভজনক কুটির শিল্প। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জে চিনামাটি আছে। বোয়েম, হাতমুখ ধোবার বেসিন ইত্যাদি তৈরি করবার উপযুক্ত মাটিও রাণীগঞ্জে পাওয়া যায়। বর্তমানে ইট এবং টালি উৎপাদনও একটি লাভজনক শিল্প। টালি তৈরির জন্য একটি সাধারণ রকমের হস্তচালিত স্ক্রু প্রেস এবং টালি

পোড়ানোর জন্য একটি সাধারণ চতুষ্কোণ চুল্লী ও একটি ছোট চিমনি সহ একটি কারখানা আট থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে স্থাপিত হতে পারে। ছোট একটি ইটের কারখানা করতেও এই রকম ব্যয় পড়ে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিস্তর রাস্তাঘাট ও গৃহনির্মাণের জন্য বর্তমানে ইট এবং টালির চাহিদা প্রচুর।

হাতির দাঁতের কাজ

এককালে শ্রীহট্ট ও মুর্শিদাবাদ হাতির দাঁতের কাজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্প বাংলাদেশে নাই বললেই চলে। দিল্লী এখন এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র-স্থল। সেখানে বহুলোক এই কাজের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খোদাই-এর সূক্ষ্মতা। বাঙালী শিল্পীরা ৭০।৮০ রকম হাতিয়ারের সাহায্যে নিপুণ-ভাবে এই কাজ করত এবং তাদের শিল্প ইউরোপেও সমাদর পেয়েছে। বাংলা দেশে এই শিল্পটির পুনর্গঠন আবশ্যক।

দেশলাই শিল্প

অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে, কুটির শিল্পে দেশলাই উৎপাদনের ব্যয় বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন খরচের চেয়ে খুব

বেশী পড়ে না। বরং, গৃহস্থঘরে বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুরা দেশলাই তৈরির কাজে লাগলে, উৎপাদন-খরচ অনেকাংশে কম পড়বে। জাপানে কুটির শিল্পে উৎপন্ন দেশলাই বিশেষ সফলতা লাভ করেছে এবং এককালে জাপানের দেশলাই ভারতের বাজার প্রায় একচেটিয়া দখল করে বসেছিল। যদি কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কুটির শিল্পীদের সস্তা বা পাইকারী দরে রাসায়নিক দ্রব্য, কাঠি, বাক্সের কাঠ, কাগজ ইত্যাদি কাঁচা মাল সরবরাহ করা যায়, তাহলে খুব সহজে এবং সুলভে কুটির শিল্পে দেশলাই উৎপন্ন হবে।

সরকার-নিয়ন্ত্রিত বড় বড় কারখানা থেকে কাঠি ও বাক্সের কাঠ কুটির শিল্পীদের যোগাবার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন এইভাবে কুটির শিল্পে দেশলাই উৎপাদনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাসিক বৃত্তি দিয়ে যুবকদের এই কাজে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেছেন। দেশলাই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারের বনবিভাগকেও সচেষ্ট হতে হবে।

কলমের বাঁট ও নিব তৈরি

কলমের বাঁট তৈরি করবার উপযুক্ত কাঠ বাংলা দেশে মেলে এবং কলমের জন্য লোহা ও টিনের পাত টাটার কারখানায় পাওয়া যেতে পারে। দৈনিক ২৫ গ্রোস কলমের বাঁট তৈরি করা যায় এরূপ একটি ক্ষুদ্র শিল্প গঠন

করতে প্রায় পনের হাজার টাকার যন্ত্রপাতি দরকার হয়। দৈনিক ৬৫ হাজার নিব তৈরি করা যায় এরূপ একটি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য প্রায় ২৫ হাজার টাকা আবশ্যক।

চর্ম শিল্প

কলিকাতায় প্রায় এক হাজার চীনা এবং ছয় হাজার বিহারী মুচি জুতা তৈরি করে। এই জুতাগুলির প্রায় সমস্তই ছোট ছোট কারখানা হাতে তৈরি হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী মুচিরা কাজের অভাবে চরম দারিদ্র্য ভোগ করছে। ছেঁড়া জুতা সেলাই আর মধ্যে মধ্যে মরা গরুর কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে ব্যাপারীদের কাছে সস্তা দামে বিক্রি করাই হল তাদের একমাত্র উপজীবিকা। পল্লীর এইসব দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুচিদের জুতা তৈরির কাজে লাগাতে পারলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হত। বাঁকুড়ার কয়েকজন খ্রীষ্টান মিশনারী স্থানীয় মুচিদের জুতা তৈরি শিক্ষা দিয়ে বিশেষ সফলতা লাভ করেছেন। এই সব মুচিদের তৈরি জুতা চীনাদের তৈরি জুতার চেয়ে কোন অংশে খারাপ হয় নাই। কাজেই পল্লী অঞ্চলের মুচিদের মধ্যে সমবায় উৎপাদন ও বিক্রয় সমিতি গঠন করে তাদের জুতা তৈরির কাজে নিযুক্ত করা দরকার। সমবায় সমিতির মারফত কারিগরদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, চামড়া ও সূতা প্রভৃতি সরবরাহ করা হবে এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্য একত্র করে

শহরের দোকানগুলিতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে। শুধু মুচিদের ব'লে নয়, আমাদের দেশের বহু শিক্ষিত যুবককেও চর্মশিল্পে আকৃষ্ট করা দরকার। ট্যানিং (Tanning), জুতা তৈরি এবং চামড়ার সুটকেশ, অ্যাটাচি কেস, ব্যাগ, বেল্ট, ফুটবল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির উৎপাদনে শিক্ষিত যুবকগণ অগ্রণী হতে পারে। বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউট এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে পাকা চামড়া ও জুতা তৈরির কথা আগেই বলা হয়েছে। খুব অল্প টাকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রামের লোকেরা এই কাজ করে লাভবান হতে পারে।

সেলুলয়েড শিল্প

কৃত্রিম দাঁত, আয়না, দাঁতের বুরুশ, চুলের বুরুশ, সিগারেট কেস, ছুরি ও ছাতার হাতল, সাবানের বাক্স, চিরুনি, চুলের কাঁটা, কাগজকাটা, পাউডারের বাক্স, চশমার ফ্রেম, বোতাম, পুতুল, খেলনা প্রভৃতি তৈরির কাজে সেলুলয়েডের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিদেশ থেকে আমদানি করা সেলুলয়েড থেকে আমাদের দেশে এই সব জিনিস তৈরি হচ্ছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করলে গ্রামাঞ্চলে এই শিল্পকে ভালভাবে চালু করা যেতে পারে।

শিরিষ শিল্প

আসবাবপত্রের কাজ, বই বাঁধাই, রোলার তৈরি এবং অন্যান্য নানা কাজে শিরিষের প্রয়োজন হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বিদেশ থেকে ভারতে শিরিষ আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে মাদ্রাজে শিরিষ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয়। শিরিষ ও জিলেটিন উৎপাদনের কাঁচা মাল আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্রামে ও শহরে প্রতি বৎসরে অসংখ্য পশু মরছে। এগুলির হাড়, স্নায়ু ও চামড়া থেকে শিরিষ তৈরি হতে পারে। পূর্বে ভারতের চামড়ার কারখানাগুলি থেকে বহু পরিমাণে বাজে জিনিস, অর্থাৎ চামড়ার চাঁচা ও কেটে ফেলে দেওয়া অংশ জার্মানিতে চালান হত। জার্মানরা সম্ভবতঃ শিরিষ তৈরির জন্যই এগুলি কিনে নিত। অতএব চামড়ার কারখানাগুলি থেকে যে বাজে মাংস, হাড় বা চামড়ার পরিত্যক্ত অংশ পাওয়া যাবে তা দিয়ে শিরিষ তৈরির ক্ষুদ্র-শিল্প গঠন করা যায়। পল্লী অঞ্চলের মৃত পশুদেহগুলিরও এই শিল্পের কাজে সদ্ব্যবহার হতে পারে। শিরিষ উৎপাদন কাজ বিশেষ কঠিন নয়। হাড়, স্নায়ু ও চামড়ার টুকরো প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করে নিয়ে জলে সিদ্ধ করা হয়। এর ফলে যে জলীয় পদার্থ প্রস্তুত হয় তাকে পরিষ্কার করে নিয়ে ঘনীভূত করা হয়। এই ঘনীভূত জলীয় পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করলে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে নিয়ে শুকানো হয়।

পরিশিষ্ট

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র-শিল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে, একশ' রকমের ক্ষুদ্র-শিল্প পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে এবং এই রাজ্যে এই সকল শিল্পের মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ৩৯০৭১০। এই সব প্রতিষ্ঠানে ৯৪৮৮০০০ জন লোক কাজ করে এবং এদের মধ্যে প্রায় সকলেই ঘরোয়া-কর্মী, বাইরে থেকে নিযুক্ত বেতনভোগী শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ ৮৮ হাজার। বছরে প্রায় ৭৭·১ কোটি টাকার কাঁচা মাল এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগে এবং এ থেকে যে কাজ হয় তার মূল্য প্রায় ১২৯ কোটি টাকা। উপরি-উক্ত বিবরণে ক্ষুদ্র-শিল্পগুলিকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে দেখান হয়েছে, যথা,—কলিকাতায় ক্ষুদ্র-শিল্প, কলিকাতার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ক্ষুদ্র-শিল্প, অন্যান্য শহরে স্থাপিত ক্ষুদ্র-শিল্প এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র-শিল্প। নিচের তালিকাটিতে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকশ্রেণীর ক্ষুদ্র-শিল্পের মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং কলিকাতার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত এরূপ একটি ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠানের গড় (Average) মূলধন দেখানো গেল :—

ক্ষুদ্র শিল্পের নাম	প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা	শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত প্রতিটির গড় মূলধন	গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত প্রতিটির গড় মূলধন
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		টাকা	টাকা
১। আটা ও ময়দার কল	২০১৮	২৩৪৩	৫৫১
২। রুটি বা বিস্কুট তৈরির কারখানা	৬৮০	১৭৭১	৩৭১
৩। মিষ্ট দ্রব্য, আইসক্রীম, বাতাসা, চানাভাজা ইত্যাদির কারখানা	২৪৬৬০	১১২৩	৪১৮
৪। তেলের ঘানি অথবা কল	১১৬১৪	৪৪২০৫	৩০৬
৫। রং এবং বানিশের কারখানা	৩৫	১১৫৩৯	১১০
৬। সাবান	২০৯	১০৩০২	৬৮১৯ (অন্যান্য শহরে)
৭। ট্যানিং (Tanning)	৭৮২	১৪৭৩	১০৬৭
৮। কাঁচ এবং কাঁচের পাত্র ও চুড়ি	১১২	২৪১৯	...
৯। মাটির বাসনপত্র	১৮২৮৩	৬৫৩	১৬৮
১০। কাগজের ও কার্ডবোর্ডের দ্রব্য	৪৪৩	৫৪০	১২
১১। কাপড়ের সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন	৫৩৫৫৮	২১৮৪	৪৫২
১২। পশমী দ্রব্য বয়ন	৮০৭	৩৩১২	২৯৫
১৩। কামারশালা	১৪৪৮২	২৮০	২৫৯
১৪। স্টীল ট্রাঙ্ক তৈরির কারখানা	১৬৮	২১১৮	২৯৯৩
১৫। ছুরি কাঁচি, ইত্যাদির কারখানা	৪০৬	১০১২	৩৩২
১৬। চামড়া ও জুতা তৈরি	৭৫৮৬	৫৪৮	২৬৯

ক্ষুদ্র শিল্পের নাম	প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা	শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত প্রতিটির গড় মূলধন	গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত প্রতিটির গড় মূলধন
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		টাকা	টাকা
১৭। রবার ও রবার দ্রব্য	১৯২	২৩৩২	১০৫৪
১৮। ইট, টালি, চুন ও সুরকির কারখানা	১১০৭	১৩১৬০	৭৮১৪
১৯। কাঠ চেরাই কারখানা	১৩০৬	১৩২৯৪	১৭০৯
২০। কাঠের জিনিস ও আসবাবপত্র	১৫১৭৫	৩৭৯৫	১৮৯
২১। বাঁশ ও বেতের দ্রব্য	১৮৯৩৭	৪৬৩	৩২
২২। তামাক দ্রব্য	২৬৬	৩০৯১	৯৪
২৩। বিড়ি তৈরি	২৩৮৯১	১০৯৬	২০০
২৪। ছাপার কাজ ও বই বাঁধাইয়ের কাজ	২০৩৩	৫৩১৬	৯০৮৮
২৫। হোসিয়ারি দ্রব্য	৫৮৭	১৭৩১২	৯০১
২৬। সূতা ও সুতার বল তৈরি	৫১২	৩০৩	৫০
২৭। জামাকাপড় ও বিছানা পত্র তৈরি, দর্জির কাজ	১৮১০৮	৮৫৬	৬০৮
২৮। দড়ি তৈরি	৬৪০৬	৯৭০১	১২১
২৯। ঘড়ি, কলম ও চশমা মেরামতের কাজ	১২০১	৬৮৫	১০৯
৩০। মাটি, কাগজ, কাঠ, সেলুলয়েড, টিন এবং অন্যান্য ধাতু থেকে পুতুল তৈরি	১৫৭৩	৮৬৫	১১৩

ক্ষুদ্র শিল্পের নাম	প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা	শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত প্রতিটির গড় মূলধন	গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত প্রতিটির গড় মূলধন
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		টাকা	টাকা
৩১। দুগ্ধ কেন্দ্র (Dairy)	১৩২৮৩	৪২২০	৭৪১
৩২। কাপড় ধোলাই	২৭১২	৭৮৭	৬৯
৩৩। টুপি, হ্যাট, পাগড়ি, জুতার ফিতা	৭৮৯	১৪১	১১২
৩৪। বোতাম তৈরি	১৪৫	২৪৮১	১৫৩
৩৫। শাঁখের জিনিস	২৩৫১	৮০৯	৪৮৬
৩৬। বাদ্যযন্ত্র	৯৫৭	৪২৭	১৭৮
৩৭। মোমের জিনিস	২৬	১১০৯৮	০০০
৩৮। মাদুর, পাটি, আসন ইত্যাদি	১৬৫৭৬	২৬১৭	৫১
৩৯। ব্রাশ তৈরি	২৭	১৬১৩০০	১৪৯
৪০। তন্তু ও তন্তুদ্রব্য উৎপাদন (coir and coir products)	১৫৩	৫২২৯৯	২২২